॥ ১ ॥

রজতের সঙ্গে ঊর্মির যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, সেদিনটার কথা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে। আমিই রজতকে ডেকে এনে-ছিলাম।

ঠিক এক বছর তিন মাস সতেরো দিন আগে। আমার চোখের আড়ালে জল্ জল্ করছে বিকেলটা। ঠিক বিকেল নয়, সন্ধ্যে গড়িয়ে এসেছে প্রায়। তখনও অন্ধকার নামে নি; চতুর্দিকে সূর্যাস্তের লাল আভা।

ঊর্মিকে নিয়ে গিয়েছিলাম গঙ্গার ধারে। ঊর্মি বছর তিনেক ছিল না, ওর দাদা সুকোমল ট্রান্সফার হয়ে গিয়েছিল দিল্লীতে, বিরাট কোয়ার্টার পেয়েছিল। শেষের দিকে দিল্লীতে ঊর্মি হঠাৎ খুব অসুখে পড়ে। দু'মাস প্রায় ভুগলো, আমি দেখতেও গিয়েছিলাম একবার।

অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর ঊর্মির চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে। টাইফয়েড-এর পর কিছুদিন যত্ন করে নিয়ম-কানুন মানলে এ রকম হয়। কলকাতায় যখন আবার ফিরে এলো, তখন ওকে দেখে মনে হয়েছিল নতুন ঊর্মি।

আউটরাম ঘাট ছাড়িয়ে স্ট্যান্ডের এই দিকটায় ঊর্মি অনেক দিন আসে নি। সেখানে দাঁড়িয়ে ঊর্মি ঘোষণা করলো, কলকাতায় এই জায়গাটার মতন এত সুন্দর জায়গা দিল্লীতে কোথাও নেই। ঊর্মি দিল্লীতে থাকতে কলকাতার অনেক নিন্দে শুনেছে, এমন কি বাঙালীরাও আপসোস করে বলতো, নাঃ কলকাতাটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একেবারে। ঊর্মি প্রথম খুব তর্ক করতো, তারপর এক সময় নিরাশ হয়ে ভেবেছিল, হয়তো এই তিন বছরে কলকাতা সত্যি বদলে গেছে।

এখন কলকাতাকে ওর নতুন করে ভাল লাগছে। বার বার

উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলছিল, এত বড় একটা নদী আর কোন্ শহরের পাশে আছে বলো তো ? নদীর ধারে দাঁড়াইলেই ভালো লাগে। এই যে এ রকম হু হু করে হাওয়া—

হাওয়ায় উড়ছিল ঊর্মির চুল আর আঁচল। ওর কথাগুলো গানের মতন ঝঙ্কারময় লাগলো। ঊর্মির শরীর থেকে চমৎকার একটা সুগন্ধ ভেসে আসে।

হঠাৎ ঊর্মি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, বিভাসদা, তুমি কখনো গঙ্গাসাগরে গেছ ?

আমি বললাম, না তো। কেন ?

ঊর্মি বললো, এখান থেকে নৌকায় চেপে সোজা গঙ্গাসাগরে যাওয়া যায় ? নিশ্চয় যাওয়া যাবে, গঙ্গা তো এখান থেকেই সোজা গিয়ে সাগরে পড়েছে।

আমি একটু হেসে বললাম, যাওয়া যাবে না কেন, তবে অনেক—দিন সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে নামখানা পর্যন্ত বাসে গিয়ে ওখান থেকে নৌকায় কিংবা লঞ্চে—

—আমাকে নিয়ে যাবে ?

—কেন হঠাৎ গঙ্গাসাগরে যাবার শখ কেন ? তীর্থ করতে নাকি ?

—না, না, তীর্থ ফির্থ নয়। গত বছর দিল্লী থেকে আমরা সবাই হরিদ্বারে গিয়েছিলাম। ঠিক হরিদ্বারে থাকি নি, আমরা ছিলাম লছমনঝোলার একটা ধর্মশালায়। সেখান থেকে জেদ ধরেছিলাম গঙ্গোত্রীতে যাবো। শেষ পর্যন্ত দাদা যেতে বাধ্য হলো।

—তাই নাকি ? কেমন লাগলো ?

—দারুণ ! অনেকটা আমরা পায়ে হেঁটে গেলাম—কেন, তোমাকে আমি লছমনঝোলা থেকে চিঠি লিখেছিলাম, মনে নেই ?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

—তুমি যদি তখন চলে আসতে পারতে—

—আমার যে আর একটা খুব জরুরী কাজ ছিল।

—তোমার খালি কাজ আর কাজ। হ্যাঁ শোনো, যা বলছিলাম

গঙ্গোত্রী দেখার পরই আমার মনে হয়েছিল, গঙ্গার প্রায় উৎপত্তিস্থানটা যখন দেখা হলো, তখন এর সাগর-সঙ্গমের জায়গাটাও একবার দেখবো। কলকাতার এত কাছে, তবু আমাদের দেখা হয় না—

—গঙ্গাসাগরে যাওয়া যেতে পারে। অসম্ভব কিছু নয়।

—তুমি আমাকে নিয়ে যাবে ? কথা দাও।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিয়ে যাব।

—না, কথা দাও আগে।

—কথা দিচ্ছি। এ আর এমন কি !

—দারুণ ব্যাপার হবে তা হলে। এত বড় একটা নদী, এর জন্মস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা···তাও তো আমরা গোমুখী পর্যন্ত যাই নি—

আমি উদার ভাবে বললাম, ঠিক আছে, আর একবার আমরা গঙ্গোত্রী গোমুখীর দিকে যাবো। আমার তো ঐ দিকটা দেখা হয় নি—

আমরা কথা বলছিলাম সিমেন্টের রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ ধরেই খেয়ার নৌকা-ঘাটের কাছে একটা গোলমাল শুনতে পাচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে সেখানে ভিড় জমছে। শোনা যাচ্ছে উত্তেজিত কথাবার্তা।

ঊর্মি জিজ্ঞেস করলো, ওখানে কি হচ্ছে ? এত চ্যাচাঁমেচি কেন ?

আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না।

—ঐ যে একজন লম্বা মতন ভদ্রলোক, উনিই তখন থেকে ধমকাচ্ছেন দেখছি।

—কোন লম্বা ভদ্রলোক ?

ঐ যে, দেখতে পাচ্ছো না ? দারুণ লম্বা।

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম, আরেঃ !

উর্মি জিজ্ঞেস করলো, কি হোল ?

—ও তো রজত।

—তোমার চেনা ?

—আমি খুব ভাল করে চিনি ওকে। ও যেখানেই যায় সেখানেই গণ্ডগোল করে।

গোলমালটা আরও বেড়ে গেল। সম্ভবত মারামারি হবার উপক্রম। আমি উর্মিকে বললাম, তুমি একটু দাঁড়াও তো, আমি দেখে আসছি, এক্ষুণি আসছি।

কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, রজত একজন মাঝির গেঞ্জিটা চেপে ধরেছে, তার সাথে একজন রোগা চেহারার যুবক তারস্বরে চাঁচাচ্ছে, আর একটি মেয়ে লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে। এদের ঘিরে অনেক মানুষ, তারা মজা দেখছে।

আমি রজতকে কোনক্রমে সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনলাম। রজত কিছুতেই আসবে না, মাঝিটা অনেকবার ক্ষমা চাওয়ায় সে একটু ঠাণ্ডা হলো।

রজতকে ওপরে নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলাম উর্মির সঙ্গে। দুজনে ভদ্রতাসূচক নমস্কার করলো। কয়েক বছর দিল্লীতে থেকে উর্মি অনেক বেশী সপ্রতিভ হয়েছে। রজত আমার দিকে ফিরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, উর্মি তাকে বললো, আপনি বুঝি যেখানেই যান সেখানেই মারামারি করেন ?

রজত একটু চমকে গিয়ে বললো, এ কথা বলছেন কেন ? আমার চেহারা দেখে গুণ্ডা টুণ্ডা মনে হয় নাকি ?

উর্মি ফুরফুরে হেসে বললো, খুব একটা অবিশ্বাসও করা যায় না।

রজতের খুব পছন্দ হল না কথাটা। আমি জানি, নিজের চেহারা সম্পর্কে রজতের বেশ দুর্বলতা আছে। সাধারণ বাঙালীদের তুলনায় সে বেশ লম্বা, খুব একটা রোগাও নয়—সেই জন্যই যে কোন ভিড়ের মধ্যে তার চেহারাটাই বেশী চোখে পড়ে। এইরকম চেহারা

থাকলে আমি খুব গর্বিত হতাম, কিন্তু রজত লজ্জা পায়। যার যে জিনিসটা আছে, সে সেটা বেশী পছন্দ করতে পারে না। রজতের ধারণা, বেশী লম্বা হওয়ার দরুন, লোক ওকে নিয়ে ঠাট্টা করে। যে চেহারার লোককে সুপুরুষ বলা হয় রজতের চেহারা তার চেয়েও একটু বেশী বড়, অনেকটা পাশ্চাত্ত্যদেশীয়দের মতন।

রজত বললো, হয়তো গণ্ডগোলই আমাকে তাড়া করে। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কিছু না কিছু একটা হয়।

উর্মি জিজ্ঞেস করলো, এখানে কি হয়েছিল ?

রজত বললো, এই যে নৌকোর মাঝিরা আছে না, এরা বেশীর ভাগই নিরীহ ভাবের মানুষ—কিন্তু দু'একজন আছে দারুণ শয়তান। আমি এদের সবাইকেই চিনি।

—আপনি কি করে সবাইকে চিনলেন ?

—আমি নৌকোর মাঝিদের নিয়ে একটা ইউনিয়ন তৈরী করার চেষ্টা করেছিলাম এক সময়। সেই সূত্রে—

আমি রজতের কথার মাঝখানেই উর্মিকে বললাম, তোমার কাছে রজতের পুরো পরিচয় দেওয়া হয় নি। রজত একজন সাংবাদিক, তাছাড়া আবার রাজনীতি করার দিকে ঝোঁক আছে। ওর একটা মোটরবাইক আছে, সেটা নিয়ে চারিদিকে টো-টো করে ঘোরে। এত জোরে চালায় মোটরবাইকটা—

উর্মি বললো, এত সুন্দর জায়গা, এখানে ইউনিয়ন কিংবা গন্ডগোল একদম ভালো লাগে না। আপনি বুঝি ওখানে ইউনিয়ন পাকাতে গিয়েছিলেন ?

রজত একবার হাসলো, বললো, না, আজকের ব্যাপারটা অন্য রকম। অনেক সময় ছেলেরা মেয়েরা এখানে নৌকোয় করে গঙ্গায় বেড়াতে যায়। একটু নিরিবিলিতে কথা বলতে চায় আর কি, এর মধ্যে দোষের তো কিছু নেই।

উর্মি বললো, নৌকোয় চেপে প্রেম, ভালই তো।

রজত বললো, যদি শুধু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যায়,

আর ছেলেটি যদি একটু দুর্বল ধরনের হয়, তাহলে, দু একটা শয়তান মাঝি নদীর মাঝখানেতে নৌকো নিয়ে গিয়ে তাদের ভয় দেখায়।

—কি ভয় দেখায় ?

—নানা রকম আজেবাজে কথা বলে। বেশী টাকা চাওয়ার ফন্দী আর কি।

—আজকেও বুঝি তাই হয়েছিল ?

—হ্যাঁ, ছেলেটি আর মেয়েটি ফিরে এসে নালিশ করছিল অন্যদের কাছে, মেয়েটি তো দারুণ ভয় পেয়ে গেছে—মাঝিটা উল্টে ওদের নামে এমন খারাপ খারাপ কথা বলতে লাগলো—এই রকম করলে আর কেউ কি নৌকায় চাপতে রাজী হবে এখানে ?

আমি এতক্ষণ শুনছিলাম। এবার বললাম, এই রকম কাণ্ড হয় নাকি ? বাবাঃ। আমিই তো একটু আগে ভাবছিলাম ঊর্মিকে নিয়ে একটু নৌকাতে বেড়াবো !

ঊর্মি তৎক্ষণাৎ বললো, চলো না, যাই।

—আর না বাবাঃ ! এই রকম কাণ্ড যদি হয়।

রজত বললো, তোমরা যেতে পারো। গোলমাল করলে দুই ধমক দিয়ে দেবে।

—না থাক, আজ আর দরকার নেই।

—আরে ভয় পাচ্ছ নাকি ! চলো, আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের।

রজত একটু জোর করতে লাগলো, আমি তাকে এড়িয়ে গেলাম। রজতটা বেরসিক। আমি ঊর্মিকে নিয়ে নৌকায় বেড়াতে চাই, তার মধ্যে কি তৃতীয় ব্যক্তির স্থান থাকে ?

আমি একটু ঠাট্টা করে রজতকে বললাম, তুমি এদিকে কোথায় এসেছিলে ? একলা একলা কেউ গঙ্গারধারে বেড়াতে আসে, এমন তো কখনো শুনি নি।

আমি এসেছিলাম অন্য কারণে। ঐ জাহাজটায় যাবো—

রজত হাত দিয়ে জাহাজ দেখিয়ে দেয়। জাহাজটার সর্বাঙ্গে আলো জ্বলছে, জলে পড়েছে তার ছায়া। হঠাৎ জাহাজটাকে

একটা রূপকথার দৃশ্য বলে মনে হয়। কি একটা দুর্বোধ্য ভাষায় জাহাজটার নাম লেখা।

আমি রজতের কথা শুনে হেসে উঠলাম, আমি জানি, রজত যখন তখন এ রকম বানিয়ে বানিয়ে অদ্ভুত কথা বলে।

রজত কিন্তু গম্ভীর থেকেই বললো, হাসলে কেন ? বিশ্বাস হচ্ছে না ?

ঊর্মিও হাসছিল। রজত বললো, আমি সত্যিই ঐ জাহাজটায় যাবো, ওখানে আমার এক বন্ধু কাজ করে।

আমি বা ঊর্মি তখনও বিশ্বাস করি নি। আমাদের চেনাশুনো জগতের কেউ গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসে বিদেশী জাহাজে ওঠে না।

ঊর্মির দিকে ফিরে রজত জিজ্ঞেস করলো, যাবেন ?

ঊর্মি তৎক্ষণাৎ বললো, চলুন।

ঊর্মির কথায় যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুর ছিল। রজত প্রায় জোর করেই আমাদের নিয়ে গেল ঘাটের কাছে। একটা নৌকা ভাড়া করলো। জাহাজটার পাশে এসে রজত আগে একা দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে। আমরা নৌকোতে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ডেকে দু'জন নাবিক দাঁড়িয়ে ছিল, রজত তাদের সঙ্গে কি যেন কথা বললো একটুক্ষণ। তারপর সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বললো, আমার চেনা সেকেণ্ড অফিসার মিঃ জেঙ্কিন্স এখন নেই, তিনি শহরে গেছেন। কিন্তু তোমরা ওপরে এসে জাহাজটা দেখে যেতে পারো, আসবে ?

শুধু শুধু একটা জাহাজ ঘুরে দেখতে রাজী হবে, এ রকম মফস্ব-লেপনা ঊর্মির নেই। সে মাথা নেড়ে বললো, থাক, দরকার নেই।

রজত দু'একবার পেড়াপেড়ি করলো, কিন্তু ঊর্মি রাজী হলো না। নেমে এলো রজত।

ঊর্মি বললো, নৌকোতে উঠেছিই যখন তখন একটুক্ষণ ঘুরি।

রজত বললে, বেশ তো !

আমি আপত্তি করলাম। গ্রীষ্মকাল, আকাশ মেঘলা। আকাশের চেহারা ভালো নয়।

আমি বললাম, না, এখন আর নৌকোয় চড়া দরকার নেই। চলো। ফিরি বরং।

রজত আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কেন, যাবে না কেন?

—ঝড় উঠতে পারে।

—ঝড়, তা উঠুক না? ঝড় উঠলে কি হবে? তুমি কি ভাবছো

—নৌকো উল্টে যাবে।

—কেন, যায় তো মাঝে মাঝে?

রজত হেসে উঠে বললো, আরে তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি? তুমি সাঁতার জানো না?

উর্মিও আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এই বিভাসদা, তুমি বুঝি নৌকোয় চাপতে ভয় পাও?

আমি একটু হেসে চুপ করে গেলাম? উর্মির কথাটাতে আমার মনে একটু আঘাত লেগেছে। আমি কি নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি? উর্মি সাঁতার জানে না, হঠাৎ যদি একটা বিপদ টিপদ হয়ে যায়। আমি পাঁচ ছ' বছর বয়েস থেকেই সাঁতার জানি, এমনকি স্রোতের গঙ্গাও আমার কাছে বিপজ্জনক নয়।

রজত বললো, তোমার ভয় নেই, বিভাস। নৌকো যদি উল্টেও যায়, আমি তোমাদের দু'জনকে বাঁচাতে পারবো। আমার লাইফ সেভিং-এর সার্টিফিকেট আছে।

রজত ধরেই নিয়েছে, আমি সাঁতার জানি না। এক একজন আছে, যারা নিজের সম্পর্কে সব কথা বেশ অনায়াসে বলে ফেলতে পারে। আমি পারি না।

সন্ধ্যেটা সত্যি বড় মনোরম ছিল। একটু জোরে হাওয়া বইছে। সেই হাওয়ার স্পর্শ ঠিক মাখনের মতন কোমল। চাঁদ ওঠে নি, ঠিক যেন বৃষ্টির মতন ঝির ঝির করে অন্ধকার নামছে।

রজত কি একটা গান গাইছিল গুণ গুণ করে। হঠাৎ এক সময়

সেটা থামিয়ে সে উর্মিকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি গান জানেন না? একটা গান করুন না!

উর্মি বললো, না, আমি গান জানি না। বিভাসদা ভালো গান করতে পারে। বিভাসদা, একটা গান গাও না।

রজত বললো, বিভাসের গান আমি শুনেছি। আপনার গান শুনতে চাই।

—আমি সত্যি গান জানি না।

—যা জানেন, তাই করুন।

—আমার গলায় সুরই আসে না।

কিন্তু নদীর ওপারে একটা নৌকোবক্ষে একজন নারীর গানই মানায়। তা ছাড়া উর্মির মতন একজন সপ্রতিভ মেয়ে গান জানে না, এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সুতরাং রজত পেড়াপীড়ি করতে লাগলো। যদিও আমি জানি উর্মির গলায় টনসিল অপারেশনের পর ঠিক সুর আসে না, তবে ও সেতার বাজাতে পারে।

নিরাশ হয়ে রজত নিজেই একটা গান ধরলো। বেশ দরাজ গলা ওর। প্রবল হাওয়ার মধ্যেও পাল্লা দিতে পারে। যদিও সুর একটু কম। তা হোক, তবু ওই রকম জায়গায় এরকম খোলামেলা গলার গানই মানায়। কি যেন ছিল সেই গানটা? হ্যাঁ। সেটাও মনে আছে, রজত গেয়েছিলো, দেখা না দেখায় মেশা হে, হে বিদ্যুৎলতা কাঁপাও ঝড়ের বুকে এ কি ব্যাকুলতা……

॥ ২ ॥

উর্মির সেই যে শখ গঙ্গা যেখানে মিশেছে সেই জায়গাটা দেখা —এটা সে সেদিন রজতের সামনেও বলেছিল কিনা আমার ঠিক মনে নেই। প্রসঙ্গক্রমে উঠতেও পারে। বিশেষত নৌকোতে বেড়াবার সময়। তা হলে এর পরবর্তী ঘটনাকে নিতান্ত আকস্মিক বলা যায় না।

রজত এর পর মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী এসেছে। দু'তিনবার দেখা হয়েছে ঊর্মির সঙ্গে। ঊর্মি আমাদের বাড়ি প্রায় রোজই আসে। ওর দাদা সুকোমলের সঙ্গে আমি ইস্কুল থেকে একসঙ্গে পড়েছি। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বহুদিনের চেনা। সুতরাং ঊর্মি আমাদের বাড়িতে আসবে, এর মধ্যে কোন দ্বিধা-সংকোচের ব্যাপার নেই। ঊর্মিকে আমি বিয়ে করবো, এটা চার-পাঁচ বছর আগেই ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির লোকেরাও ব্যাপারটা জানে। কিন্তু কেউ কোন উচ্চবাচ করে নি। তার কারণ, আমাদের জাতের অমিল। আমাদের বা ঊর্মির পরিবারটা খুব গোঁড়া না হলেও জাতের সংস্কারটা এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারে নি। ভিন্ন জাতের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক করতে নিজে থেকে এগিয়ে আসতে পারবে না। ভাবখানা এই, আমি আর ঊর্মি যদি জোর করি তা হলে ওঁরা মেনে নেবেন।

আমার ঠিক পরের বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। আগামী মাসেই তার বিয়ের তারিখ। ওর বিয়েটা না হওয়া পর্যন্ত আমি নিজের বিয়েটা পিছিয়ে দিয়েছি। এটাই সবদিক থেকে ভালো দেখায়।

ঊর্মিকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলেছি, তোমার তো পরীক্ষা-টরীক্ষা হয়ে গেছে, হাতে কোনো কাজ নেই, দেখো যেন ঝট করে অন্য কারুকে বিয়ে-টিয়ে করে বসো না!

ঊর্মি ঠাট্টা করে উত্তর দিয়েছে, আমি যে আর একদিনও অপেক্ষা করতে পারছি না। আমি যে মরে যাচ্ছি একেবারে!

একদিন আমি একটা সংকটের মধ্যে পড়েছিলাম। সেদিন বাড়ীতে কেউ ছিল না। ফাঁকা বাড়ী, এই সময়ে ঊর্মি এসে উপস্থিত। বুকের মধ্যে ছমছম করে উঠে।

ঊর্মির জন্য কখনো আমাকে লুকোচুরির আশ্রয় নিতে হয় নি। কখনো প্রয়োজন হয় নি লুকিয়ে দেখা করার কিংবা অন্যদের মিথ্যে কথা বলার। ওকে যে-কোন সময় আমি টেলিফোন করেছি

কিংবা চিঠি লিখেছি, বাড়ির লোকেরা সবাই জানে। ঊর্মির অসুখের সময় যে আমি ওকে দিল্লীতে দেখতে গেলাম—সে ব্যাপারেও কেউ কোনো প্রশ্ন করে নি। এটা যেন আমার অধিকার।

কিন্তু ফাঁকা বাড়ীতে মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। ঊর্মিকে চুমু টুমু খেয়েছি অনেকবার, বেশী এগোই নি কখনো। সেদিন বুকের মধ্যে ঝড় বইতে লাগলো, কিংবা ঠিক ঝড় নয়, কি যেন একটা বুকের মধ্য থেকে ফেটে বেরোতে চাইছে।

আমি ঊর্মিকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, ঊর্মি আমি তোমাকে দেখতে চাই।

ঊর্মি আমার ঘাড়ের কাছে ঠোঁট রেখে দুষ্টুমিভরা গলায় বলেছিলো, উঁহু!

আমি ওর গলা, বুক ও কোমর আচ্ছন্ন করে দিলাম চুমোতে। ঊর্মি প্রায় পাগলের মতন হয়ে উঠলো। শারীরিক আদরে ঊর্মি যতখানি আনন্দ পায়, ততখানি বাইরেও প্রকাশ করে। রেখে-ঢেকে রাখে না। তা ছাড়া আমার কাছে ওর লজ্জা দেখাবারও কোনো কারণ নেই। শরীরের মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার এক বিন্দুও নষ্ট করতে চায় না ঊর্মি। ও নিজেই ওর ব্লাউজের কয়েকটা বোতাম খুলে আমাকে বলেছিল, তুমি এইখানটায় মুখ রাখো, আমাকে খুব জোরে ধরো—

পাশেই বিছানা। ঊর্মির কোমরে আমার হাত, আর একটা হাত ওর শাড়ীর আঁচলে। ইচ্ছে করলে এক্ষুণি আমরা চরম আনন্দে মেতে উঠতে পারি।

ঊর্মিকে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েও আমি থেমে গেলাম। হঠাৎ মনে হলো, কোন বাধা যখন নেই, তখন এত তাড়াতাড়ির কি আছে? এটা তো শুধু আনন্দের ব্যাপার না, এটার মধ্যে যেন অনেক পবিত্রতাও রয়েছে। আর বড়জোর দু'মাস বাদেই তো বিয়ে হবে—এ ব্যাপারটা সেদিনের জন্য তোলা থাক।

আসলে তখন আমি প্রচন্ড নির্বোধ ছিলাম। জীবনের সবচেয়ে

বড় ভুল করেছি সেদিন।

ঊর্মি প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিল, তবু আমি তাকে বললাম, ইস্, আর একটু হলে কি করে ফেলেছিলাম! না, না, এখন থাক—সব জমা থাক সেই দিনটার জন্য—

ঊর্মিও সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিল নিজেকে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, বিভাসদা, তুমি কি ভালো! আমাকেও তোমার মতন ভালো করে দাও না! আমি যদি কখনো কোনো ভুল করতে যাই, তুমি আমাকে সাবধান করে দিও। দেবে তো?

আমি বলেছিলাম, আমরা দু'জনেই দু'জনকে ভালো করবো। আরো অনেক অনেক বেশী ভালো।

যাক, রজতের কথা বলছিলাম। রজতের সঙ্গে ঊর্মির খুব ভাব হয়ে গেল, এতে আমার ঈর্ষার কোনো কারণ নেই। ভালোবাসা মানে বন্ধন নয়। আমি ঊর্মিকে কক্ষনো সম্পূর্ণ আঁকড়ে ধরতে চাই নি—ওর ইচ্ছে-অনিচ্ছের মূল্য দিয়েছি সব সময়, ওকে খোলা-মেলা থাকতে দিয়েছি।

রজত খুব ভদ্র ছেলে। মাঝে মাঝে উল্টো-পাল্টা মিথ্যেকথা বলে, হৈ চৈ চেঁচামেচি করতে ভালবাসে, কিন্তু কখনো অসঙ্গত কিছু করে না। বন্ধুত্ব, স্নেহ, মমতা—এই সবের মূল্য দেয়। ওর চেহারাটা যেমন বড়, তেমনি ওকে দেখলেই মনে হয়, ওর প্রাণশক্তিও যেন অনেক বেশী। ওর মধ্যে একটা অ্যাডভেঞ্চারের নেশা আছে—যারা হিমালয়ে উঠেছে কিংবা হেঁটে মরুভূমি পার হয়েছে কিংবা ডুব দিয়ে সাগরের তলায় নেমেছে, রজত যেন সেই মানুষের দলে।

রজত একদিন এসে বললো, ও ওদের কাগজের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগরের মেলায় যাচ্ছে।

ঊর্মি তখন উপস্থিত ছিল। শুনেই তো লাফিয়ে উঠলো। ছেলেমানুষের মতন বলতে লাগলো আমিও যাবো, আমিও যাবো—

রজত বললো, চলুন না—

—মেয়েরা যেতে পারে?

—কেন পারবে না?

—তাহলে আমি ঠিক যাবো। আমাকে নিয়ে যাবেন?

—আমি হাসতে হাসতে রজতকে বললাম, তুমি নিয়ে যাও না ওকে! ওর খুব গঙ্গাসাগর দেখার ইচ্ছে।

ঊর্মি আমার দিকে ফিরে ভ্রূ কুঁচকে রাগের সঙ্গে বললো, তার মানে? তুমি যাবে না?

—মেলার সময় দারুণ ভিড় হবে যে।

—হোক না ভিড়।

—অত ভিড়ের মধ্যে যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন, তোমাকে বলেছি তো আমি একবার নিয়ে যাবো—

—কেন? এখন যাবো না কেন? এখন বেশ সবাই যাচ্ছে।

রজত বললো, অন্য সময় যাওয়ার খুব সুবিধে নেই। এখনই বরং অনেক লঞ্চ স্টীমার কিংবা স্পেশাল বাস যায়—

ঊর্মি বললো, আমরা স্টীমারে যাবো, সেই বেশ মজা হবে।

রজত আমাকে বললো, চল না, দেখে তোমারও ভাল লাগবে।

আমি বললাম, কিন্তু ওখানে থাকা হবে কোথায়? হোটেল টোটেল আছে?

রজত হাসলো। তারপর বললো, সে সব নেই অবশ্য। তুমি বড়লোক মানুষ, তোমার একটু অসুবিধে হবে অবশ্য।

রজতের এই এক দোষ, আমাকে মাঝে মাঝেই বড়লোক বলে খোঁচা দেয়। আমাদের পরিবারের অবস্থা সচ্ছল, আমি একটা ভালো চাকরি করি—এটা কি আমার দোষ? আমরা কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা বলেই আমাদের একটা নিজস্ব বাড়ী আছে। রজতের বাড়ী নেই, কিন্তু আজকাল সাংবাদিকরাও তো ভালোই মাইনে পায়। রজত কাজ করে সবচেয়ে নাম-করা ইংরেজী কাগজে।

আমি বললাম, সুবিধে অসুবিধের প্রশ্ন উঠছে না। থাকার তো একটা জায়গা চাই। আমি যেখানে খুশি থাকতে পারি—কিন্তু ঊর্মি, মানে, মেয়েদের তো একটা আলাদা থাকবার জায়গা না হলে চলে না।

রজত বললো, সে একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

ঊর্মি বললো, আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না, আমি যে-কোন জায়গায় থাকতে পারবো—সবাই যেখানে থাকবে।

আমি বললাম, কিন্তু বাথরুম টাথরুম।

ঊর্মি বললো, অত সব চিন্তা করলে চলে না।

রজত বললো শুনুন, শুনুন, আমি বলছি। আগে আর একবার আমি তো ঐ মেলায় গেছি, তাই আমি ব্যবস্থা ট্যাবস্থা জানি। সবাই যেখানে থাকে সেখানে আপনারা থাকতেও পারবেন না। থাকতে হবেও না। এত বেশী ভিড় হয় যে মানুষজন সবাই খোলা মাঠেই শুয়ে থাকে—কিছু কিছু হোগলার ছাউনি হয় বটে, কিন্তু সেখানে আর ক'জন জায়গা পায়!

—তা হলে আমরাও কি খোলা মাঠে?

—না। গভর্নমেন্ট-এর অফিসার এবং মন্ত্রীদের জন্য আলাদা তাঁবু থাকে, অনেকগুলি ঘর তৈরী হয়। ঘরগুলো অবশ্য খড় আর হোগলা দিয়ে তৈরী—কিন্তু থাকা যায় মোটামুটি, মাটিতে খড় পেতে গদি করে—

ঊর্মি বললো, তা হলে ভালই।

রজত বললো, বাথরুমেরও ব্যবস্থা আছে এমনকি রান্নাঘর পর্যন্ত—যদি কেউ রান্না করতে চায়।

আমি বললাম, এসব তো গভর্নমেন্ট অফিসার আর মন্ত্রীদের জন্য, সেখানে আমাদের থাকতে দেবে কেন?

রজত বললো, সাংবাদিকদের জন্যও আলাদা অনেকগুলো ঘর আছে। তা ছাড়া আমি যদি তোমাদের জন্য এইটুকু ব্যবস্থাও না করতে পারি, তা হলে আর সাংবাদিক হয়েছি কেন?

ঊর্মি বললো, ব্যস তা হলে ঠিক হয়ে গেল। বিভাসদা, আমরা তবে কবে যাচ্ছি?

ঊর্মি সত্যিই ছেলেমানুষ। এত সহজে কি সব ঠিক হয়? এখনো তো ঊর্মির সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি। তবে আগেই কি স্বামী-স্ত্রীর মতন দু'জনে বেড়াতে যেতে পারি?

ঊর্মি ওর বাড়ি থেকে একা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে বলে যেতে পারে। আমার পক্ষেও সেরকম ভাবে যাওয়া খুবই সহজ। কিন্তু দুজনে এক জায়গায় গেলে পরে সেটা জানাজানি হয়ে যাবেই। আমি চট করে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। মাত্র আর দু'তিন মাস পরেই যেটা খুব স্বাভাবিক হয়ে যাবে, এখন সেটাই হবে একটা কলঙ্কের ব্যাপার। এ রকম ভাবেও অনেক ছেলে-মেয়ে যায় আজকাল। কিন্তু আমার মনটা ঠিক সায় দেয় না।

ঊর্মিকে নিরস্ত করার জন্য আমি বললাম, কিন্তু আমার যে অনেক কাজ পড়ে গেছে এই সময়। অফিসে এমন কতকগুলো জরুরী কাজ আটকে গেছে।

ঊর্মি বললো, রাখো তোমার অফিস! তুমি না থাকলে বুঝি তোমার অফিস চলবে না?

রজত সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে বললো, আরে চলোই তো, দেখবে খুব ভালো লাগবে!

আমি রজতকে বললাম, তোমার আর কি! তুমি তো দিব্যি যাচ্ছো অফিসের কাজে। কাজও হবে, বেড়ানোও হবে।

রজত বললো, আমি বেড়াতে ভালবাসি বলেই এসব জায়গায় যাই। নইলে আমি অফিসকে বলে অন্য কারুকে এবার পাঠাতে পারতাম, আমি তো আগে একবার গেছি—

চট করে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। আমার যে বোনের শিগগিরই বিয়ে হচ্ছে, তাকে নিয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঝর্ণার সঙ্গে ঊর্মির বেশ ভাব আছে। ওরা দুজনে যদি

যায়, তা হলে আমি ওদের অভিভাবক হিসাবে অনায়াসেই যেতে পারি। বিসদৃশ কিছু দেখাবে না।

ঝর্ণাকে আমি কথাটা বলতেই সে রাজী। ঊর্মিও অনুরোধ করলো তাকে। বাবা-মাকেও রাজী করানো গেল। আর কোনো অসুবিধে নেই। ঠিক হয়ে গেল যে আমি ঝর্ণাকে সঙ্গে করে নিয়ে ঊর্মির বাড়ি থেকে তাকে তুলে নেবো—রজত দাঁড়িয়ে থাকবে ওর অফিসের সামনে—আমার অফিসের গাড়িটাই আমাদের নামখানা পেঁছে দিয়ে আসবে। সেখান থেকে লঞ্চ!

কিন্তু ঝর্ণাই শেষ পর্যন্ত গণ্ডগোল বাধালো। যাবার আগের দিন ওর একটু জ্বর এসে গেল। সামান্য সর্দি-জ্বর যদিও, কিন্তু বাবা-মা ওকে আর যেতে দিতে কিছুতেই রাজী হলেন না। গঙ্গাসাগরে গিয়ে খোলা হাওয়ায় ওর যদি জ্বর বেড়ে যায়? কয়েকদিন পরেই যার বিয়ে, তার সম্পর্কে এই ঝুঁকি নেওয়া যায় না।

ঝর্ণা বেচারী নিরাশ হয়ে গেল খুব। ওর দারুণ ইচ্ছে ছিল যাওয়ার। ও প্রাণপণে জ্বরটা লুকোতে গিয়েও ধরা পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, ঝর্ণা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে, ও ঠিকই বুঝেছিল ঊর্মির জন্যই আমি ওকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। ঝর্ণা আমাকে বললো, দাদা তুমি কিন্তু ঊর্মিকে ঠিক নিয়ে যাবে। আমার জন্য ওর কেন যাওয়া হবে না? কেউ কিছু বললে না, তুমি নিয়ে যাও।

আমিও সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম। ঊর্মি তৈরী হয়ে বসে থাকবে, এখন কি ওকে আর বলা চলে যে যাওয়া হবে না? ঊর্মি যে ভীষণ জেদী মেয়ে।

ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। ঊর্মিদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন দিতেই ও তৈরী হয়ে নেমে এলো। বিস্মিত ভাবে বললো ঝর্ণা কোথায়? ঝর্ণা আসে নি?

আমি ওকে ঝর্ণার কথা জানালাম।

ঊর্মির মনটা খারাপ হয়ে গেল। আন্তরিকভাবে বললে, ইস্ বেচারী যেতে পারলো না। আচ্ছা, ও গেল না, তবু যদি আমি

যাই, তাহলে ও কি দুঃখ পাবে?

আমি বললাম, না না, তাতে কি হয়েছে। ও পরে কখনো যেতে পারবে নিশ্চয়ই। এখন রিস্ক্ নেওয়া যায় না বলেই—

আমি যেন ঊর্মিকে যেতে রাজী করাচ্ছি। ওকে তুলে নিয়ে চলে এলাম রজতের অফিসে। রজত সেখানে নেই।

আমাদের আসবার কথা ছিল সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে। আমরাই বরং পনেরো মিনিট দেরি করে ফেলেছি। রজত কি আমাদের ফেলেই চলে গেল? ঊর্মির সেই রকমই ধারণা হলো।

আমি অফিসের দারোয়ানের কাছে খবর নিয়ে জানলাম রজত, তখনো আসে নি।

আমি আর ঊর্মি কাছাকাছি একটা দোকানে চা খেতে গেলাম।

ঊর্মিকে খুব উচ্ছল দেখাচ্ছে। ও পরেছে একটা বেলবটম প্যান্ট আর একটা কারুকার্য করা শার্ট। দিল্লীতে মেয়েরা এরকম পোশাক খুব পরে, কলকাতায় যে পরে না তা নয়, কিন্তু এটাকে ঠিক তীর্থযাত্রার পোশাক বলা যায় না। তা হোক না। আমরা তো তীর্থ করতে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি প্রকৃতি-দর্শনে। কপালকুণ্ডলার নায়ক নবকুমার যে-কারণে গিয়েছিল।

আমি বললাম, ঊর্মি তোমাকে তো খুব সুন্দর মানিয়েছে।

ঊর্মি বললো, তোমার পছন্দ হয়েছে? এমনি রাস্তায়-ঘাটে পরতে লজ্জা করে, বাইরে যাচ্ছি বলেই—

—আমরা যখন কাশ্মীরে যাবো, তখন তুমি এ রকম পোশাক যত ইচ্ছে পরতে পারবে!

—আমরা কাশ্মীরে যাচ্ছি বুঝি? কবে?

—এই ধরো আর মাস তিনেক বাদেই।

ঊর্মির মুখটা খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে মেয়েরা সাধারণত একটু লজ্জা পায়। ঊর্মির খুশীটা বাইরে বেড়াতে যাবার জন্য। ও বাইরে বেড়াতে খুব ভালবাসে। আমি ওকে বিদেশে বেড়াতে নিয়ে যাবারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলেছি।

চা খেয়ে ফিরে এসেও দেখলাম, রজতের পাত্তা নেই। এদিকে সাতটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। রজত নিজেই বলেছিল, বেলা বেড়ে গেলে দারুণ ভীড় হবে। লঞ্চে জায়গা পাওয়া যাবে না।

ঊর্মি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অসহিষ্ণু ভাবে বললো, তোমার বন্ধু কি রকম! বড় দায়িত্বহীন তো!

আমি বললাম, কোনো কারণে আটকে পড়েছে নিশ্চয়ই।

—একটি টেলিফোন করে খবর দিতে তো পারতো।

—আর একটু অপেক্ষা করে দেখোই না।

—প্রায় এক ঘণ্টা হয়ে গেল। যদি যাওয়া না হয়?

—অত চিন্তা করতে হবে না। রজত যদি শেষ পর্যন্ত নাও আসে, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বেরিয়ে যখন পড়েছি, আর ফিরবো না।

আমার কথার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ তুলে মোটর সাইকেল নিয়ে রজতকে আসতে দেখা গেল।

রজতের বড় বড় চুলগুলো উড়ছে। চোখে কালো চশমা, গায়ে ডোরাকাটা রঙীন একটা জামা। মোটরসাইকেল-আরোহীদের সাধারণত বেশী বীরপুরুষের মতন দেখায়, বসার ভঙ্গিটার জন্য। রজতকে আধুনিক কালের এক দস্যু-দলপতির মতন দেখাচ্ছে।

দেরীতে আসবার জন্য রজত কোনোরকম ক্ষমা প্রার্থনা বা ভনিতা করলে না। চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে উৎফুল্ল ভাবে বললো, তোমরা এসে পড়েছো? বাঃ! আমি ধরেই নিয়েছিলাম তোমাদের দেরি হবে।

ঊর্মি বললো, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।

সত্যিই আমরা দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ির পাশে রাস্তায়। রজত হাসতে হাসতে বললো, কেন, দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? গাড়ির মধ্যে বসে থাকলেই পারতেন। তাহলে এখন বেরিয়ে পড়া যাক?

আমি বললাম, আমরা রেডি। আমার বোন আসতে পারলো না।

রজতও ওর মোটরসাইকেলটা রেখে এলো অফিসের মধ্যে। তারপর আমার গাড়িতে উঠে এসে বললো, বিভাস, তুমি ড্রাইভার এনেছো কেন? গাড়ি তো আমিও চালাতে পারি। শুধু শুধু ওকে অতদূর নিয়ে যাবে।

গাড়ি চালানোটা কোন সমস্যা নয়। গাড়ি চালাতে তো আমিও জানি। কিন্তু রজতের মতন এরকম অপ্রাসঙ্গিক ভাবে সে কথা আমি কখনও জানাতে পারতাম না।

একটু হেসে বললাম, আমরা ফিরবো দুদিন পরে। কিন্তু অফিসের গাড়ি তো দুদিন নামখানায় পড়ে থাকতে পারবে না।

রজত বললো, ও অফিসের গাড়ি! আমি তো গাড়িটা দেখে ভেবেছিলাম একটু চালাবো।

—তা চালাও না। ড্রাইভার পাশে বসছে।

রজত সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারের আসনে গিয়ে বসলো। তারপর ফাঁকা রাস্তা পেয়েই দারুণ স্পীড দিল। একটু পরেই বোঝা গেল রজত দুঃসাহসী। বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালাতে ভালবাসে। এটা ওর চরিত্রের সঙ্গে মানায়।

বেশী জোরে গাড়ি চালালে, পেছনের সীটে কোনো কোনো মেয়ে ভয় পায়। কোনো কোনো মেয়ে খুশীর উত্তেজনা বোধ করে। ঊর্মি সেই দ্বিতীয় দলের। ঊর্মি খুশী দেখেই আমি আর রজতকে সংযত হতে বললাম না। ড্রাইভার যদিও আমার দিকে বার বার ভীতভাবে তাকাচ্ছে।

রজত অন্তত তিনবার দুজন মানুষ এবং একটি ছাগলছানাকে চাপা দিতে দিতে কোনোক্রমে রক্ষা পেল। একবার এত জোরে অকস্মাৎ ব্রেক কষলো যে আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

রজত দীপ্তমুখে পেছন ফিরে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, কি, ভয় করছে না তো?

ঊর্মি বললো, আপনি মোটেই ভালো গাড়ি চালাতে পারেন না।

রজত তখন আরো গতি বাড়িয়ে দিল। আমি মৃদু গলায় বললাম, আমাদের প্রাণ যায় যাক, শুধু যেন গাড়িটার কোনো ক্ষতি না হয়, সেটা দেখো। অফিসের গাড়ি।

রজত আর উর্মি দুজনেই এ কথায় হেসে উঠল হো হো করে।

নামখানার কাছাকাছি এসে, পথে যখন মানুষজনের ভিড় খুব বেড়ে গেল, সেখানে অবশ্য আমি প্রায় জোর করেই রজতকে সরিয়ে ড্রাইভারকে বসালাম সেখানে। একটু পরে আর গাড়ি চলতে পারলো না। আমরা নেমে গেলাম।

রজত এই সময় উর্মির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি এ কি পোশাক পরে এসেছেন!

সে এমনভাবে উর্মির দিকে তাকিয়ে রইলো যেন আগে কখনো তাকে দেখে নি।

উর্মি একটু অবাক হয়ে বললো, কেন, কি হয়েছে?

—এরকম পোশাক পরে কেউ গঙ্গাসাগর যায় নাকি?

—সেখানে যাবার জন্য বুঝি বিশেষ কোনো পোশাক আছে?

—তা নয়, তবু সাধারণ পাঁচজনে যে রকম পরে।

—আমি তো এটাতে কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না।

না, না, এটা ছেড়ে একটা শাড়ি পরে ফেলুন।

রজতের সঙ্গে উর্মির প্রায় একটা ঝগড়া হবার উপক্রম হচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আরে রজত, তুমি যে এত গোঁড়া, তা তো আমি জানতাম না! এরকম তো আজকাল অনেকেই পরে।

রজত বললো, তা পরুক। কিন্তু একটা তীর্থস্থানে এরকম বড়লোকের মতন পোশাক পরে আলাদা থাকার কোনো মানে হয় না। সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়াই উচিত।

উর্মি একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, আর আপনি যে জামাটা পরে আছেন, সেটাই বা কি এমন সাধারণ?

রজত বললো, আমার কথা আলাদা। আমি রিপোর্টার মানুষ, আমাদের পোশাক যে রকমই হোক—

উর্মি বললো, আমাকে আর একটু চিনলে বুঝতে পারবেন, আমার কথাও আলাদা।

আমি পরে আছি একটা সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট। এটাই আমার প্রতিদিনকার পোশাক। ওখানে জল-কাদায় ঘোরার জন্য আমি একটা খাকি রংয়ের প্যান্ট এনেছি অবশ্য। কিন্তু সাদা রংই আমি বেশী ব্যবহার করি। তা হলেও, অন্যদের গায়ের রংচঙে পোশাক আমার খুব ভালোই লাগে, বিশেষত মেয়েদের। আমি রজত আর উর্মির তর্কাতর্কির মাঝখানে হাত তুলে বললাম, পোশাকের কথা নিয়ে এখন সময় নষ্ট করার কি মানে হয়? তার বদলে লঞ্চের খোঁজ করা উচিত নয়? উর্মি তো সঙ্গে শাড়িও এনেছে। ওখানে পৌঁছে না হয় পোশাক বদলে নেবে।

চতুর্দিকে অসম্ভব ভিড়। কন্যাকুমারিকা কিংবা হিমালয় থেকেও এসেছে মানুষ। অরণ্যের সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়াও, সাধারণ মানুষও কম নয়। অনেকে এসেছে পায়ে হেঁটে। বেশীর ভাগই গরীব। এই তীর্থটা বুঝি শুধু গরীবদেরই তীর্থ। 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গা-সাগর একবার।' এত দূর থেকে এত কষ্ট কিসের টানে মানুষ আসে কে জানে!

অব্যবস্থার চূড়ান্ত। একসঙ্গে এত মানুষকে সামলাবার মতন ব্যবস্থাপনা এখানে নেই। হুড়মুড় করে সবাই মিলে লঞ্চে উঠতে গিয়েছিল বলে লঞ্চ-ঘাটটা নাকি বিপজ্জনক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। পুলিশ আটকে রেখেছে সে জায়গাটা। এদিকে জনতা উত্তাল হয়ে উঠেছে, কাল ভোরেই পুণ্যস্নানের শুভক্ষণ, আজকের মধ্যেই সবাই পৌঁছতে চায়।

যারা পুণ্য অর্জন করতে চায় না, শুধু দৃশ্য দেখতে চাও—তাদের পক্ষে গঙ্গাসাগরে যাওয়ার এইটাই প্রকৃত সময় নয়। এইটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আমার বিরক্ত লাগছিল।

উর্মির কিন্তু উৎসাহ একটুও কমে নি। সে বললো, চলো তাহলে লঞ্চের দিকে যাই।

আমি বললাম, কি করে যাবে এই মানুষের দেয়াল পেরিয়ে ?

রজত বললো, কোনো চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

রজত সাংবাদিক, সে সরকারী আমলাদের চেনে, তাদের কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারে।

রজত গিয়ে দেখা করলো এস, ডি ও-র সঙ্গে। তিনি বললেন যে একটা লঞ্চ রাখা আছে বটে, কিন্তু এ ভীড় ঠেলে সেদিকে যাবেন কি করে ?

রজত বললো, আমাকে যেতেই হবে। আমি তো আর নাম-খানায় বসে রিপোর্টিং করতে পারি না।

রজত আমার দিকে ফিরে বললো, বিভাস তোমার জুতো খুলে ঝোলায় পুরে নাও, তারপর আমার পেছনে পেছনে এসো।

এস, ডি, ও আমাদের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন বাংলোর পেছন দিয়ে। সেই পথে খুব কাদা। তিনি আমাকে বললেন, আপনারা পুরুষমানুষ, আপনারা যেতে পারবেন ঠিকই। কিন্তু আপনার মিসেস-এর খুব কষ্ট হবে।

তিনি ঊর্মিকে ধরে নিয়েছেন আমার স্ত্রী। আমি প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলাম। প্রতিবাদ করে বলবোই বা কি। রজত আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসলো। ঊর্মিই সামলে দিল ব্যাপারটা, সে বললো, না, না, আমার কিছু কষ্ট হবে না।

ঊর্মি ওর বেলবটম প্যাণ্টটা গুটিয়ে নিল প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। তারপর বললো, চলো।

নদীর ঘাটে এসে দেখলাম, সেখানেও প্রচণ্ড ভিড়। রজত বীরবিক্রমে দু'হাতে সেই ভীড় ঠেলে ঠেলে এগোতে লাগলো— আমরাও গলে যেতে লাগলাম সেই ফাঁকে! রজত নির্দয় ভাবে লোককে গুঁতোগুঁতি করছে। সে রকম না করে উপায়ও নেই।

লঞ্চও ভর্তি হয়ে আছে মানুষজনে। এরা সবাই অনধিকারী। যে যেখানে পেরেছে উঠে পড়েছে। সেখানে আর তিলধারণের

জায়গা নেই। রজত তবু দমলো না। একজন পুলিশ ডেকে এনে তার সাহায্যে টেনে হিঁচড়ে কুড়ি পঁচিশজন লোককে নামিয়ে দিল। লঞ্চের ছাদটা খালি করে দিল একেবারে! আমরা সেখানে উঠে এলাম।

লঞ্চের সারেং ছাদে বসে আপন মনে বিড়ি খাচ্ছে। আমাদের দেখে বললো, লঞ্চ এ বেলা ছাড়বে না। জোর বাতাস দিচ্ছে। সমুদ্রে এখন বড় বড় ঢেউ। এ সময় লঞ্চ চালানো বিপজ্জনক।

রজত যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, সে কিছুতেই রাজী হয় না। রজতের হঠাৎ মেজাজ গরম হয়ে গেল, সে সারেং-এর কলার চেপে ধরে ঘুষি মারতে গেল। আমি মাঝখানে পড়ে রজতকে ছাড়ালাম। সারেংকে ধরে মারলে কোনক্রমেই লঞ্চ চলবে না।

রজত আবার নেমে গেল। বাংলো থেকে ডেকে আনলো একজন সরকারী অফিসারকে। তিনি হুকুম দিলেন লঞ্চ ছাড়বার।

শেষ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হলো। লঞ্চ যখন মধ্য-নদী দিয়ে ছুটে চললো জোরে, হু হু করে গায়ে লাগছে বাতাস, তখন আগেকার সব অসুবিধের কথা মন থেকে মুছে যায়।

ঊর্মি বললো, আপনি না থাকলে তো আমাদের আসাই হতো না।

রজত বললো, এখন ভালো লাগছে কিনা, বলুন ?

ঊর্মি বলল, দারুন দারুন।

আমি চলে এলাম সারেং-এর কাছে। লোকটি এখনো রাগ করে আছে। আমি তাকে একটি সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, সারেং সাহেব, রাগ করবেন না। আমার বন্ধুর একটু মাথা গরম— তা ছাড়া আজ আমাদের পেঁছোতেই হবে।

সারেং-এর আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে, তা ছাড়া লোকটি অহংকারী প্রকৃতির। কিছুতেই আমার সিগারেট নেবে না। তার কাঁধে হাত দিয়ে অনেক করে বোঝালাম। রজতের হয়ে বার বার ক্ষমা চাইলাম। এক সময় সে শান্ত হলো এবং আমার কাছ থেকে

সিগারেট নিলো। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। লোকটার মনটা খুব সাদা। ফিরে এসে দেখলাম, ঊর্মি আর রজত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রেলিং ধরে, নদীর গতিপথের দিকে মুখ। হাওয়ায় উড়ছে ঊর্মির চুল, এক হাত তুলে সে চুল সামলাচ্ছে। সেই ভঙ্গিতে কি সুন্দর দেখায় ওকে। আমি পিছন থেকে এসে ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

॥ ৩ ॥

সেবার নাকি মেলায় ভিড় হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। কপিলমুনির আশ্রমটাকে ঘিরে উন্মুক্ত মাঠের মধ্যেই শুয়ে আছে কয়েক লাখ নারী-পুরুষ।

আমাদের অবশ্য তেমন অসুবিধে হলো না। সাংবাদিক ও অফিসারদের জন্য এক জায়গায় অনেকগুলো সাময়িক বাড়ি-ঘর বানানো হয়েছে। একজন অফিসারের সস্ত্রীক আসার কথা ছিল, তিনি শেষ মুহূর্তে আসতে পারবেন না জানিয়েছেন। সেই ঘরটা আমরা নিয়ে নিলাম।

রজত আমাকে বললো, তোমরা দু'জনে এখানে থাকো। আমার তো আলাদা জায়গা আছেই।

আমি বললাম, কেন, তুমিও এখানে থাকতে পারো না? একটা রাত্তিরের তো ব্যাপার!

রজত বললো, না ভাই, আমার অন্য সাংবাদিকের সঙ্গেই থাকা উচিত। না হলে সেটা খারাপ দেখায়।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ঊর্মির সঙ্গে আমার একঘরে থাকাও কি ভাল দেখায়? অন্য কেউ জানে না আমরা স্বামী-স্ত্রী কিনা, কিন্তু রজত তো জানে। তাছাড়া, অন্য কেউ যদি ঊর্মির সিঁদুর নেই দেখে কোনরকম সন্দেহ করে।

আমি রজতকে বললাম, তোমাদের ওখানে কি বেশী জায়গা আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, অঢেল জায়গা। আমাদের জন্য পাঁচ খানা ঘর দিয়েছে।

—তা হলে, আমিও কি তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারি? কেউ কি আপত্তি করবে?

—আপত্তি আবার কে করবে? সবাই তো আমাদের চেনা।

—তা হলে আমি তোমাদেরই সঙ্গে রাত্রে থাকবো—ঊর্মি এখানে একা থাকুক। ঊর্মি, তুমি একা থাকতে পারবে তো?

ঊর্মি বিচিত্র ভাবে হেসে বললো, পারবো না কেন?

আমরা তিনজনে মিলেই রজতের জায়গাটা দেখতে গেলাম।

বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফাররা এসেছে। কয়েকজন বিদেশী টেলিভিশান কোম্পানীর প্রতিনিধিও আছে তার মধ্যে। এক জায়গায় সবাই মিলে হৈ হৈ করে রান্না শুরু করে দিয়েছে। নতুন হাঁড়ি, নতুন হাতা-খুন্তি। ইঁটের তৈরী উনুনে বসানো হয়েছে খিচুড়ি। একজন আবার একটা মস্তবড় কাতলা মাছ ছুরি দিয়ে কুটতে বসেছে। কাছেই একটা গ্রামে নাকি সস্তায় পাওয়া গেছে মাছটা। তীর্থক্ষেত্রে বসে মাছ রান্নার ব্যাপারটা শুধু বাঙালীদের পক্ষেই সম্ভব।

আমাদের দেখে ওরা আপ্যায়ন করতে লাগলো খুব। ঊর্মির দিকে একটু বেশী মনোযোগ যে দেবে তা তো স্বাভাবিক। কয়েকজন মদের বোতল খুলে বসেছিল, তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললো গেলাসপত্র। ঊর্মিও লেগে গেল ওদের রান্নায় সাহায্য করতে।

রজত আর আমি একটা আলাদা ঘর পেলাম। শুধু খড়ের ওপর একটা চাদর পেতে শোওয়া। আমার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। রজত অবশ্য বহুরকম অবস্থায় থেকেছে, কিন্তু আমি এমনভাবে কখনো কোথায় যাইনি। প্রথমে একটু মানিয়ে নেবার অসুবিধে হলেও বেশ ভালোই লাগছে। আমি ভালোছেলের মতন শুধু পড়াশুনা করছি, তারপর চাকরি-বাকরীতে ঢুকে পড়েছি—এই ধরনের রোমাঞ্চকর জীবন কাটাবার সময় পাই নি কখনো।

অনেক রাত পর্যন্ত আমরা তিনজন ঘুরে বেড়ালাম বাইরে। তখনও মানুষজন আসবার বিরাম নেই। কচুবেড়িয়ার মোড় থেকে যারা পায়ে হেঁটে কিংবা বাসে-রিক্সায় আসছে, তাদের মেলায় প্রবেশ করার জন্য একটাই মাত্র ছোট ব্রিজ। সেখানে অসম্ভব ঠ্যালাঠেলি। এক সময় নাকি ব্রিজের রেলিং ভেঙে কয়েকজন মানুষ নীচে পড়ে গেছে। অবশ্য নীচে জল-কাদা মেশানো নরম মাটি, কারুর প্রাণহানির সম্ভাবনা নেই, তবু ঘটনার বিবরণ নেবার জন্য সাংবাদিক হিসেবে রজতকে যেতেই হয়। আমরা ওর সঙ্গে যাই।

ভিড়ের মধ্যে যাতে ঊর্মি হারিয়ে না যায়, তাই আমি ওর হাত ধরে রেখেছিলাম শক্ত করে।

ঊর্মি হেসে বললো, বাবা রে বাবা, তুমি এমন ভয় করছো, যেন আমি একটা কচি খুকি!

এই কথা শুনে আমি যেই ঊর্মির হাত ছেড়ে দিলাম, তার একটু পরেই ঊর্মি হারিয়ে গেল।

আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে ঊর্মিকে আর দেখতে পেলাম না। একটু দূরেই রজত একটা ছোট্ট খাতা খুলে দুর্ঘটনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নোট করছে, কিন্তু কাছাকাছি ঊর্মি কোথাও নেই। চতুর্দিকে শুধু মানুষের মাথা—কারুকে চেনাও শক্ত। অল্প কয়েকটা আলোতে অন্ধকার দূরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায় নি।

আমি রজতের কাছে গিয়ে বললাম, ঊর্মি কোথায়?

রজত সঙ্গে সঙ্গে খাতা বন্ধ করে বললো, জানি না তো! তোমার সঙ্গেই তো ছিল।

আমি একটু চিন্তিত হয়ে বললাম, হ্যাঁ তা ছিল, হঠাৎ যে কোথায় চলে গেল—

—কোথায় আর যাবে? আছে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও—

—কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে—

—ঠিক আছে, খুঁজে দেখা যাক্। তুমি ঐ দিকটায় যাও, আমি এই ডান দিকটাতে।

রজত আর আমি ঊর্মিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। এত মানুষের ভিড়ে সহজে হাঁটাও যায় না। একটু জোরে হাঁটতে গেলেই মানুষজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। অনেকে অবশ্য ধাক্কা দিয়েই চলে যাচ্ছে, কেউ তার প্রতিবাদও করছে না।

সেই ভিড়ের মধ্যে দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা পুরোনো কথা মনে পড়লো। অনেকদিন আগে, তখন আমার বয়েস সতেরো-আঠারোর বেশি না—ঊর্মিদের বাড়ির সবাই আর আমাদের বাড়ির লোকেরা মাঝরাত্তিরে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। বাগবাজারের প্যান্ডেলে অসম্ভব ভিড়, তার মধ্যে ঊর্মি হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি, মাইকে তার নাম ডাকাডাকি হয়েছিল, সবাই দারুণ চিন্তিত, ঊর্মির বয়স তখন পনেরো—রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না। শেষ পর্যন্ত আমিও ঊর্মিকে খুঁজে পেয়েছিলাম। ঊর্মি বেশ ভয় পেয়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখার পর বলেছিল, বাড়ির লোকেদের আর একটু ভয় দেখানো যাক না। আমরা তক্ষুণি ফিরে যাই নি। পুজো প্যান্ডাল থেকে বেরিয়ে মধ্যরাত্রির নির্জন রাস্তায় আমরা বেরিয়েছিলাম খানিকক্ষণ। সেই প্রথম আমি ঊর্মির হাত ধরেছিলাম। এমনিতে একটি চেনা মেয়ের হাত ধরা এমন কিছুই না। নানা কারণে আগেও হয়তো অনেকবার ধরেছি, কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, এই হাতটা আমার নিজস্ব। কি কোমল আর উষ্ণ, যেন একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, আমি সত্যিই আমার নাকের কাছে ঊর্মির হাতটা এনে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করেছিলাম। সেইদিনই প্রথম বুঝেছিলাম ভালোবাসা কাকে বলে।

আজ এই গঙ্গাসাগর মেলায় ঊর্মিকে অনেকক্ষণ খুঁজেও বার করতে পারলাম না। আমার মনে হতে লাগলো, রজত বোধহয় এতক্ষণে ঊর্মিকে খুঁজে পেয়েছে, সে আগেও এসেছে বলে এ জায়গা আমার চেয়ে ভালো চেনে। এখন ওদের দুজনকে আমি খুঁজে পাবো কি করে?

এই কথা মনে হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অদূরে আমি দেখতে

পেলাম উর্মিকে। একটা গোল করা ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। কাছাকাছি রজত নেই।

আমি পেছন থেকে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, এই উর্মি!

উর্মি মুখ ফিরিয়ে হেসে বললো, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

—বাঃ, তুমিই তো হারিয়ে গেলে।

—আমি তো অনেকক্ষণ থেকে এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। তোমরাই তো হারিয়ে গেছো।

—রজত কোথায়?

—আমি তো জানি না। আসবে নিশ্চয়ই। দ্যাখো, এখানে দ্যাখো কি অদ্ভুত কাণ্ড!

আমি ভিড় ঠেলে উর্মির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভিড়ের মধ্যে একটি বিচিত্র দৃশ্য। একজন সাধুর সমস্ত দেহটা মাটির মধ্যে পোঁতা, শুধু মাথাটুকু বেরিয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় মাটির ওপরে পড়ে আছে একটা কাটামুণ্ডু।

ভিড়ের লোকের মন্তব্য শুনে বুঝলাম, এই সাধুটি এইরকম অবস্থায় নাকি তিন দিন ধরে রয়েছে।

এই সব সাধুদের গল্প আগে শুনেছি যদিও, তবু এখন চোখে দেখলেও ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। এই রকম ভাবে একটা লোক তিনদিন থাকতে পারে? কে একে খাইয়ে যায়?

সাধুটির মুখটি বেশ প্রশান্ত, স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে, সে নাকি কারুর সঙ্গে একটাও কথা বলে না। শরীরকে এরকম কষ্ট দিয়ে সাধুরা কি পেতে চায়, আমি বুঝতে পারি না।

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখি, এ দিকটা সাধুদেরই পাড়া। কোনো সাধু শুয়ে আছে এক গোছা কাঁটাতারের ওপর। কেউ সারা গায়ে ইঁট চাপা দিয়ে আছে। লোক-মুখে শুনলাম, একটু পরেই আর একজন সাধু এসে পেঁছোবেন, তিনিই সবার সেরা তিনি শুয়ে থাকেন কাঠকয়লার আগুনে।

তার একদিকে প্রায় লাইন করে বসে আছে নাগা সন্ন্যাসীর দল। প্রত্যেকের হাতে ত্রিশূল, বিশাল বিশাল চেহারা এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কারুর কারুর লিঙ্গে লোহার আংটা বাধা—ওরা যে জিতেন্দ্রিয়, সেটা বোঝাবার জন্যই বোধ হয়। উলঙ্গ পুরুষ মানুষ দেখতে আমার একটুও ভাল লাগে না। গা শির শির করে। উর্মি পাশে আছে বলে আমার লজ্জা করে আরও বেশী। অবশ্য, তীর্থ-স্থানে এসে এ রকম মনের বিকার থাকা বোধহয় উচিত নয়।

উর্মির কিন্তু একটুও বিকার নেই। সে নাগা সন্ন্যাসীদের দিকে তাকিয়ে বললো, এই শীতের মধ্যে ওরা এ রকম খালি গায়ে থাকে কি করে?

আমি বললাম, পৃথিবীতে এরকম অনেক আশ্চর্য ব্যাপার আছে।

—ওরা গায়ে ছাই মেখে থাকে, তাতে বোধহয় বেশ গরম হয়।

—সেই সঙ্গে গাঁজা খায়।

যাই বলো, সাধু হওয়ার একটা বেশ উপকারিতা দেখতে পাচ্ছি। সব সাধু-রই স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়। মুক্ত আকাশের নীচে পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়াই জীবন কাটানো বোধহয় মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এরা কত স্বাধীন।

—সেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'।

—সেটাই বোধহয় ভালো ছিল।

একজন নাগা সন্ন্যাসী আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকলো। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন একটা হুকুমের ভাব ছিল যে আমরা কাছে না গিয়ে পারলাম না। সাধুটি আমাদের কপালে দুটো ছাইয়ের টিপ পরিয়ে দিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তাকে দিলাম। আমি সাধুটির দিকে তাকাতে পারছিলাম না। উর্মি সাধুটির সঙ্গে কি যেন কথা বলতে যাচ্ছিল, আমি ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম।

সেখানে উর্মি ছাড়াও আরও কয়েকজন মহিলা ছিলেন।

দু'একজনকে দেখে মনে হয় বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের। তারাও ঐ সব উলঙ্গ সাধুদের কাছে গিয়ে শিবশঙ্করের পয়সা দিয়ে ছাইয়ের টিপ পরে পুণ্য অর্জন করছেন। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের লজ্জাবোধ আসলে বোধহয় কম। কিংবা বোধহয় ভুল বললাম। এখানে একজন নগ্ন সন্ন্যাসিনী থাকলে পুরুষদেরও কি ভিড় হত না?

একটুক্ষণ আমরা রজতকে খুঁজলাম। পাওয়া গেল না কোথাও। যাই হোক, রজতের জন্য চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

উর্মি বললো, চলো, আমরা একটু সঙ্গমের ধার থেকে ঘুরে আসি। যাবে?

—এই রাত্তিরেই?

—চলো না।

অনেক নিদ্রিত ও জাগ্রত মানুষের পাশ দিয়ে আমরা হেঁটে এলাম নদীর কিনারায়। এ দিকটা বেশ অন্ধকার। এত রাত্তিরেও কয়েকজন স্নান করছে সেখানে। শুনলাম কেউ কেউ নাকি সূর্যোদয় পর্যন্ত জলের মধ্যেই থেকে স্তবপাঠ করবে। শীতের মধ্যে এতক্ষণ জলে দাঁড়িয়ে থাকা—কত রকম পাগলই যে আছে!

উর্মি তাকিয়ে আছে দূরের অন্ধকারের দিকে। আমি ওকে বললাম, তা হলে শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর দেখা হলো তো?

উর্মি আমার একবার বাহু ছুঁয়ে বললো, কি ভালো যে লাগছে! সেই গঙ্গোত্রীতে দাঁড়িয়েই মনে মনে ভাবছিলাম, একদিন তোমার সঙ্গে গিয়ে গঙ্গার শেষ মুখে দাঁড়াব। কিন্তু এত তাড়াতাড়িই যে সেখানে আসা হবে, ভাবি নি।

আমি বললাম, রজত না থাকলে কিন্তু আমাদের এত তাড়াতাড়ি আসা হতো না।

উর্মি আমার বুকে হাত দিয়ে বললো, আমার ভালো লাগছে, আমার খুব ভালো লাগছে।

আমি উর্মির গালে হাত ছোঁয়ালাম। কি উষ্ণ হয়ে থাকে ওর শরীরটা। সে কথা উর্মিকে বলতেই ও আপন মনে হেসে উঠলো।

॥ ৪ ॥

খানিকটা বাদে আমরা ফিরে এলাম আমাদের বাসস্থানের দিকে। রজতের ঘরে উঁকি মেরে দেখলাম, রজত ওর খড়ের বিছানায় শুয়ে আপন মনে সিগারেট টানছে। আমি বললাম, একি, তুমি এখানে? আর আমরা তোমাকে খুঁজছি।

রজত বললো, আমাকে কি খোঁজার কথা ছিল?

উর্মি বললো, আমাকে তো খোঁজার দরকার ছিল। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, আর আপনি এখানে নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন?

রজত এবার হাসতে হাসতে উত্তর দিল, আমি দূর থেকে দেখলাম আপনারা দুজনে জলের দিকে যাচ্ছেন, তখনই বুঝলাম আর খোঁজাখুঁজির দরকার নেই, তাই আমি আমার কাজ সেরে এলাম সেই ফাঁকে।

—এখানে আপনার আবার কি কাজ? এত রাত্রে?

—বাঃ খবর পাঠাতে হবে না? মেলা অফিসের টেলিফোন থেকে ট্রাঙ্ককল-এ খবরগুলো পাঠিয়ে দিলাম আমার অফিসে।

—কি কি খবর পাঠালেন?

—তার মধ্যে আপনার হারিয়ে যাওয়ার খবরটাও আছে।

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম একসঙ্গে। উর্মি ঘরের মধ্যে এসে বসলো। কিছুক্ষণ গল্প করার পর রজত তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি শুতে যাবেন না?

খুব একটা যেন ইচ্ছে নেই, এরকম ভাবে উর্মি বললো, আপনারা এখন ঘুমোবেন নাকি?

—বাঃ ঘুমবো না? আবার তো ভোরেই উঠতে হবে।

—তা হলে আমিও যাই। একলা একলা যাবো?

—বিভাস, যাও, ওঁকে পৌঁছে দিয়ে এসো—

আমি উর্মিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। উর্মির ঘরটা কাছেই। ভেতরে আলো জ্বালা নেই! অন্ধকারে উর্মি আমাকে ধরে রইলো

আমি দেশলাই জবাললাম! ঊর্মির মুখখানা একটু যেন বিবর্ণ। অচেনা জায়গায় একা ঘরে শোওয়ার অভ্যাস ওর নেই। আমার বুকটা মুচড়ে উঠলো। আমি যদি ওর সঙ্গে রাতটা এখানে কাটাতে পারতাম! কি বাধা আছে তাতে! বিয়ে টিয়ে এগুলো তো আসলে নিয়ম রক্ষা মাত্র। এগুলো গ্রাহ্য না করলে কি হয়? আমরা যদি সেই নিয়ম ভাঙি, তবু সমাজ আমাদের কোনো শাস্তি দিতে পারবে না। সমাজের সে জোর আর নেই। তবু শুধু চক্ষুলজ্জার ব্যাপারটা এড়াতে পারি না।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ঊর্মিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলাম। ঊর্মির সারা শরীরটা কাঁপছে। আমার শরীরের সঙ্গে নিজের শরীরটা প্রায় মিশিয়ে দিয়ে ঊর্মি বললো, আমার একা থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না।

আমি অতিকষ্টে মনের জোর এনে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, একটু ঘুমোও—কয়েক ঘণ্টা তো মাত্র—তারপর আমরা এসে তোমাকে ডেকে তুলবো—

—যদি আমার ভয় করে?

—দূর, ভয়ের কি আছে।

আমি ঊর্মিকে দু'হাতে পাঁজাকোলা করে তুলে শুইয়ে দিলাম ওর বিছানায়। ঊর্মি তবু ওর হাতটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। তবু আমি অতিকষ্টে নিজেকে দমন করে চলে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে মনে হলো, আজ থেকে দু'তিন মাস পরেই যদি এখানে আসতাম, তা হলে কত সহজে আমি ঊর্মির সঙ্গে থেকে যেতে পারতাম। এই রাতটা বৃথা যেত না। বিয়েটিয়ের ব্যাপারগুলো যতই সংস্কার হোক তবু সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। যাই হোক, আর দু'তিন মাস বাদে আমরা এর চেয়েও ভালো কোনো জায়গায় তো যাবোই—

আমাদের ঘরে এসে দেখলাম, রজত কোথা থেকে ব্রান্ডির বোতল বার করে তাতে চুমুক মারছে।

আমাকে দেখে বললো, গেলাস ফেলাস নেই। মাটির গেলাসে এসব খাওয়া যায় না। তুমি বোতল থেকে চুমুক দিয়ে খেতে পারবে?

আমি বললাম, আমি খাই না ভাই।

—খাও না তো কি হয়েছে? আজ একটু খাও, বেশ শীত শীত পড়েছে, গা গরম হয়ে যাবে।

—না ভাই, দরকার নেই। অফিসের একটা পার্টিতে একবার খেয়েছিলাম, আমার একটুও ভালো লাগে নি।

—তুমি একটা টিপিক্যাল গুডবয়। আমি খেলে তোমার আপত্তি নেই তো?

—না, না, আপত্তি কিসের!

—তা হলে তোমার যদি ঘুম পায়, ঘুমিয়ে পড়ো, আমি আর ঘণ্টাখানেক বাদেই—

আমি ঘুমোবার চেষ্টা না করে একটা সিগারেট ধরালাম। আগুন টাগুনের ব্যাপারে এখানে খুব সাবধানে থাকতে হয়। চারিদিকে শুধু খড় আর হোগলা, যে-কোনো মুহূর্তে আগুন ধরে যেতে পারে।

তখন সিগারেটটা শেষ হয়নি। কে যেন আমাদের দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগলো। আমি তড়াক করে উঠে দরজাটা খুললাম।

উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ঊর্মি দাঁড়িয়ে আছে।

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ঊর্মি ঘরের মধ্যে ঢুকে এলো। তারপর বিহ্বল গলায় বললো, আমি কিছুতেই ও ঘরে থাকতে পারবো না। ওখানে ভূত আছে।

—ভূত!

রজত হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললো, ভূত আবার কি?

ঊর্মি ঝাঁঝের সঙ্গে বললো, নিশ্চয়ই ভূত আছে। কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ, কানের পাশে ফিস ফিস করে কথাবার্তা।

রজত বললো, নিশ্চয়ই পাশের ঘরের শব্দ। শুধুমাত্র হোগলার

দেওয়াল—এত পাতলা দেওয়াল দেওয়া ঘরে তো আগে কখনো থাকেন নি।

—মোটেই না। সে রকম শব্দ শুনলেই বোঝা যায়। মোট কথা আমি ওখানে একলা থাকতে পারবো না। কিছুতেই পারবো না, আমি এখানে থাকবো, তাতে আপনাদের অসুবিধে আছে ?

আমি ঊর্মির হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে। তুমি এখানেই থাকো। তোমাকে আর ও ঘরে যেতে হবে না।

এতক্ষণে রজতের হাতের ব্রাণ্ডির বোতলটার দিকে চোখ পড়লো ঊর্মির। এবার সে রীতিমত ঝাঁঝালো গলায় বললো, ও, এই জন্যই আপনারা আমাকে ও ঘরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন ? মদ খাবার জন্য ? আপনারা অনায়াসেই আমার সামনে খেতে পারেন। আমার শুচিবাই নেই।

আমি ঊর্মিকে বললাম, আরে, তুমি এত রাগ করছো কেন ? ব্যাপারটা তা নয়।

রজত ঊর্মির দিকে সোজা চোখে বললো, আপনি দুটি ভুল করেছেন। 'আপনারা' নয়, শুধু আমি একাই মদ খাচ্ছি। আপনার ভাবী স্বামী খুবই সচ্চরিত্র, তিনি এসব খান না। আর আমার দিক থেকেও আপনাকে লুকোবার কোনো কারণ নেই। আমি আপনাকে অন্য ঘরে যেতে বলেছিলাম যাতে বিভাসও আপনাকে পৌঁছাতে গিয়ে সেখানেই থেকে যায়। বিভাসের মতন একটা ইডিয়েট ছাড়া আর কেউ তার বান্ধবীকে ওরকম একা ঘরে ফেলে চলে আসতো না।

আমি লজ্জায় মুখটা ফিরিয়ে বললাম, এই সব নিয়ে কোনো মন্তব্য করতেও আমার লজ্জা করে।

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য ঊর্মি রজতকে বললো, আমি ভূতের কথা বললাম বলে আপনি হেসে উঠলেন কেন ?

রজত বললো, ভূত আবার কি ?

—বাঃ এখানে প্রত্যেক বছরই তো অনেক লোক মরে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভূত হতে পারে না ?

মানুষ মরলেই ভূত হবে নাকি ? যত সব আজেবাজে কথা। অবশ্য মেয়েরা ভূতের ভয় পেতে ভালবাসে। এক এক সময় ভয় পেলে মেয়েদের বেশ মানায়।

—আপনি বুঝি ভূতে বিশ্বাস করেন না ?

—আমি ভূত কিংবা ভগবান কোনোটাতেই বিশ্বাস করি না।

—আপনি তাহলে কিসে বিশ্বাস করেন ?

—আমি শুধু বিশ্বাস করি, আজকের এই বিশেষ মুহূর্তটাকে। যে সময়টাতে আমি বেঁচে আছি। আমি অতীতের কোনো কিছুর জন্যই অনুতাপ করি না, ভবিষ্যতের জন্যও মাথা ঘামাই না।

—তা হলে তো মানুষের ন্যায়-নীতি এসবেরও তো কোনো মূল্য থাকে না।

—আমি যে খুব একটা ন্যায়-নীতি করি, সে কথাই বা কে বললো আপনাকে ?

ওদের কথাবার্তার মধ্যে আমি চুপ করে বসেছিলাম। রজত যে কথাগুলো বলছে, তা কখনো মানুষের জীবনে সত্যি হতে পারে না। অতীত বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে না, এমন মানুষ নেই। কিছু কিছু ন্যায়-নীতি অধিকাংশ মানুষকেই মানতে হয়, নিজের নিরাপত্তার জন্যই। তবু রজত যে কথাগুলি বলছে, তা অনেক সময় শুনতে ভালো লাগে।

কথাবার্তা আবার ভূতের প্রসঙ্গে ফিরে আসছিল বলে আমি বললাম, রজত তুমি কিন্তু ভেবো না যে ঊর্মি সত্যিই ভূতের ভয় পায় কিংবা ভূত বিশ্বাস করে। আমি তো কোনদিন দেখি নি। আজ ওর একা থাকতে ভালো লাগছিল না বলেই ভূতের কথা বলছে।

রজত বললো, ভূত-টুত বোধহয় গত শতাব্দী পর্যন্ত ছিল, এখন আর তারা পৃথিবীতে আসে না।

রজতের এই কথাটা আমি কখনো ভুলিনি। খুবই সাধারণ কথা তবু আমার মনে দাগ কেটে গিয়েছিল। পরে বহুবার এই কথাটা আমার মনে পড়েছে, ঊর্মিকেও মনে করিয়ে দিয়েছি।

রজত ব্রান্ডির বোতল থেকে চুমুক দিচ্ছিল। সেই দেখে ঊর্মি আমাকে বললো, বিভাসদা, তুমি খাচ্ছো না কেন? আমার জন্য?

আমি যে কোনদিন ওসব খাই না, ঊর্মি তা ভালো করে জানে। কিংবা মাঝখানে তিন বছর ও দিল্লীতে ছিল, ভেবেছে বোধহয় সেই সময়ের মধ্যে আমি বদলে গেছি। অথবা ঊর্মিই খানিকটা বদলেছে।

আমি বললাম, কেন, তোমারও খেতে ইচ্ছে করছে নাকি?

ঊর্মি অনাবিল ভাবে হেসে বললো, আমি দিল্লীতে দু'একবার খেয়েছি। ওখানকার পার্টি টার্টিতে অনেক মেয়েরাই খায়, কেউ কিছু মনে করে না।

রজত বললো, এখানের পার্টিতে অনেক মেয়ে খায়, এমন কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

আমি ঊর্মিকে বললাম, তোমার ইচ্ছে করে তো একটু খাও না।

ঊর্মি আমার দিকে গাঢ় ভাবে তাকিয়ে বললো, তুমি না খেলে আমি খাবো না।

—আমার খেতে ভালো লাগে না তাই খাচ্ছি না, আমার তো কোনো সংস্কার নেই।

রজত একটু ঠাট্টার সুরে বললো, তুমি অনুমতি না দিলে উনি খেতে পাচ্ছেন না।

—বাঃ; অনুমতির আবার কি আছে!

ঊর্মি আমার গলায় হাত রেখে আদুরে গলায় বললো, তুমি একটু খাও। কি হবে—কিছুই হবে না। তুমি একটু না খেলে আমি কিছুতেই খাবো না।

অগত্যা আমাকে একটা চুমুক নিতেই হলো। প্রথমে গন্ধটাই আমার খুব খারাপ লাগে। তারপর তরল পদার্থটা জ্বলতে জ্বলতে নামে গলা দিয়ে। ঠিক যেন আগুনের একটা স্রোত। উঃ এত কষ্টতেও মানুষ আনন্দ পায়।

বোতলটা আমি বাড়িয়ে দিলাম ঊর্মির দিকে। ঊর্মি যখন

সেটা মুখের কাছে নিয়ে গেল, তখন আমি আর রজত একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে আছি। রজত আনমনে তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের ওপর একটা সিগারেট ঠুকছে। এইটা রজতের একটা বাতিকের মতন। প্রত্যেকবার সিগারেট ধরাবার আগে ও নখের ওপর একটু ঠুকবেই কয়েকবার।

ঊর্মি বেশ অবলীলাক্রমেই এক ঢোঁক খেয়ে ফেললো। মুখে কোনো বিকৃতি দেখা গেল না। হাতের উল্টো পিট দিয়ে ঠোঁটটা মুছে বললো, এটা কি জিনিস?

রজত বললো, ব্রান্ডি। তীর্থস্থানে এসে আপনাকে মদ দিলাম কিন্তু।

—ব্রান্ডিকে ঠিক মদ বলা চলে না। অনেকে অসুখের সময়েও খায়। দিল্লীতে আমার অসুখের সময়েও খেয়েছিলাম।

—দিল্লীতে আপনার কি অসুখ হয়েছিল?

—সে যাই হোক না। এখন আমি মোটেই অসুখের গল্প করতে চাই না।

—তা হলে এখন কিসের গল্প হবে বলুন?

—একটা কিছু গল্প বলুন না। আপনি ভূতের গল্প জানেন?

—আপনাকে তো বললামই আমি ভূতে বিশ্বাস করি না, ভূতের গল্প কি করে জানবো!

—ভূত বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, ভূতের গল্প কিন্তু শুনতে কিংবা পড়তে বেশ ভালোই লাগে।

আমি বললাম, রজত ওর নিজের জীবনের কোনো গল্প বলুক বরং। ও তো অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছে। তাছাড়া ওর কত বান্ধবী। তাদের সম্পর্কেও বলতে পারে—

ঊর্মি জিজ্ঞেস করলো, আপনার অনেক বান্ধবী বুঝি?

রজত কোনো রকম ভনিতা না করে উত্তর দিল, আট দশজন হবে অন্তত। আমি তো কারু প্রেমে পড়ি না! তবে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে আমার বেশ ভালোই লাগে।

ঊর্মি বললে, ভূত ভগবানের মতন আপনি বুঝি প্রেমেও বিশ্বাস করেন না ?

—না। বন্ধুত্বই যথেষ্ট।

—মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের ঠিক বন্ধুত্ব হয় ?

—কেন হবে না ? আমার সঙ্গে হয়।

—ঠিক আছে, আপনার বান্ধবীদের সম্পর্কেই দু'চারটে গল্প বলুন।

রজত আমার দিকে ব্রান্ডির বোতলটা আবার বাড়িয়ে দিল। আমি বললাম, না ভাই, আর নেবো না। এক চুমুক দেবার কথা ছিল, সেটা তো হয়ে গেছে—

ঊর্মি আর এক চুমুক দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, বিভাসদা, আমি আজ একটা সিগারেট খাবো ? খুব ইচ্ছে করছে।

ঊর্মির এই প্রশ্নের মধ্যে এমন একটা ছেলেমানুষী সরলতা ছিল যে আমার খুব মায়া হলো। তাছাড়া, মেয়েরা সিগারেট খেতে পারবে না—এমন কোনো ধারণা আমার নেই। আমি বললাম, খাও না।

রজত ততক্ষণে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়েছে ওর দিকে। নিজের লাইটারে সেটা ধরিয়ে দিল। ঊর্মি কেশে উঠলো কয়েকবার, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো, তবুও ওর মুখে হাসি।

সেইরকম হাসতে হাসতে বললো, এই অবস্থায় আমার বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলতো, কি ভাবতো ? মদ খাচ্ছি, সিগারেট খাচ্ছি—

রজত বললো, তা ছাড়া রাত্তিরবেলা দু'জন পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে রয়েছেন—

আমি বললাম, কথাগুলো শুনতে যে রকম খারাপ, আসলে কিন্তু তেমন নয়। মানুষের মনটা কি রকম, তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করে।

এই রকম কথাবার্তা চলছিল। কখন যে আমি এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছি, নিজেই জানি না।

আবার চোখ মেলেই ধড়মড় করে উঠে বসলাম, দেখলাম, ঊর্মি আর রজত শোয় নি। দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে বসে ওরা তখনও গল্প করে যাচ্ছে। বাইরে ঈষৎ ভোরের আলো দেখা যায়।

আমাকে জেগে উঠতে দেখে রজত বললো, খুব বাবা! দিব্যি একটা ঘুম সেরে নিলে।

আমি লজ্জিত ভাবে বললাম, কখন যে ঘুম এসে গেছে, নিজেই টের পাই নি। তোমরা আমাকে ডাকলে না কেন ?

ঊর্মি বললো, তুমি তো কথা বলতে বলতেই হঠাৎ চোখ বুজলে। প্রথমে তো আমরাও বুঝতে পারি নি যে ঘুমোচ্ছ। ভেবেছিলাম এমনিই চুপ করে আছো।

—তোমাদের একটুও ঘুম পায় নি ?

ঊর্মি বললো, আমার রাত জাগা অভ্যাস আছে। একটুও ঘুম পায় না।

রজত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আর কি, ভোর তো হয়েই এলো, চলো, এবার বেরুনো যাক।

আমরা তিনজনে ঘর থেকে বাইরে এলাম। বহুলোক এরই মধ্যে জেগে উঠেছে, গঙ্গার ধারে কোলাহল পড়ে গেছে রীতিমতন।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য। কয়েক লক্ষ মানুষ একসঙ্গে নেমে পড়েছে স্নান করতে। এর মধ্যে আবার বেশ কিছু গরু-বাছুরও আছে। জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গরুর ল্যাজ ধরে মন্ত্র পড়লে নাকি মৃত্যুর পর বৈতরণী নদী পার হওয়া যায় সহজেই। সেখানেই চলেছে নানা রকম চিৎকার ও মন্ত্রপাঠ। পুণ্য অর্জনের কি ব্যাকুল চেষ্টা।

দূরে গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, সেই বিপুল জলরাশিতে মিশেছে নতুন সূর্যের রক্তিম আলো। সেদিকে তাকিয়ে মনটা উদাস হয়ে যায়। আমি আগেও বহুবার সমুদ্র দেখেছি, তবু আমাদের

আবাল্যপরিচিত গঙ্গা নদী এখানে এসে লীন হয়ে যাচ্ছে, এই কথা ভাবলে রোমাঞ্চ হয়।

রজত বলে, চলো, আমরাও স্নানটা করে নিই, তা হলে বেশ ফ্রেস লাগবে।

ঊর্মি বললো, আমি তা হলে তোয়ালে টোয়ালেগুলো নিয়ে আসি?

আমি খুব একটা উৎসাহিত বোধ করলাম না! এত লোকের ভিড়ের মধ্যে স্নান করতে আমার একটুও ভালো লাগে না। কি রকম যেন নোংরা নোংরা মনে হয়। তীর্থযাত্রীরা সাধারণত পরিচ্ছন্ন হয় না। যে-গঙ্গা নদীকে তারা এত পবিত্র মনে করে, সেখানেই তারা থুথু ফেলছে কিংবা নাক ঝাড়ছে।

রজত সেখানেই তার শার্ট ও প্যাণ্ট খুলে ফেললো। এত লোকজনের সামনে জামাকাপড় ছাড়তে তার একটুও লজ্জা হয় না। গেঞ্জিটাও খুলে ফেলে সে শুধু আণ্ডারওয়্যার পরে জলে নামবার জন্য তৈরি হলো।

আমার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি জামা টামা খুলবে না?

—আমি স্নান করবো না।

—সেকি? এতদূর কষ্ট করে এসে শেষ পর্যন্ত স্নান করবে না?

—আমি তো স্নান করতে আসি নি, দেখতে এসেছি।

রজত আমার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো। বার বার বলতে লাগলো, আরে চলো, চলো! একবার নেমে পড়লেই—

—না, ভাই, সত্যি আমার ইচ্ছে করছে না।

—তুমি যে জলকে এত ভয় পাও, তা তো জানতুম না।

আমি এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। এই সময় ঊর্মি তোয়ালে জামাকাপড় নিয়ে এসে হাজির হলো।

রজত তাকে বললো, আপনার বিভাসদা তো স্নান করতে রাজী নয়।

ঊর্মি বললো, একি, তুমি স্নান করবে না?

—নাঃ, তোমরা যাও।

ঊর্মি আমাকে আর বেশী জোর করলো না। ওরা দু'জনে চলে গেল জলের দিকে। রীতিমতন মানুষদের দল ঠেলে সরিয়ে সরিয়ে যেতে হয়।

ঊর্মি ওর শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বেঁধেছে। পায়ের খানিকটা উঁচু করে তুলে ধরেছে। জলে এক পা ছুঁইয়েই বললো, বাবাঃ বেশ ঠাণ্ডা।

রজত ঊর্মির হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে গেল। একটু বাদে ওদের আর দেখতে পেলাম না মানুষের ভিড়ে ভিড়ে। আমি তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রজত আর ঊর্মির পোশাক পাহারা দিতে লাগলাম।

ওদের দু'জনকে বোধহয় স্নানের নেশায় পেয়ে বসেছে। আধঘণ্টার মধ্যে ওঠার নাম নেই। মাঝে মাঝে দেখতে পাই, মাঝে মাঝে হারিয়ে যায়। চারিদিকে এত গোলমাল যে আমি চেঁচিয়ে কিছু বললেও ওরা শুনতে পাবে না।

ওপরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে একটা ব্যাপারে আমার খুব অস্বস্তি হতে লাগলো। ভারতের বিভিন্ন জাতের নারী-পুরুষ স্নান করতে এসেছে এখানে। অনেকেরই আবার ব্যবহার আলাদা। অনেক মেয়েরা এখানে যে পোশাকে স্নান করতে নেমেছে কিংবা স্নান করে উঠে যেভাবে পোশাক বদলাচ্ছে, সেটা ঠিক আমাদের বাংলা-দেশের মতন নয়। এরা অনেকেই ব্লাউজ পরে না এবং সম্পূর্ণ বুকটা খুলে দাঁড়াতে কোনো লজ্জা নেই। আমি পুরুষ মানুষ, আমার চোখ তো সেদিকে যাবেই।

কিন্তু এক সময় আমার মনে হলো, লোকেরা বোধহয় ভাবছে, আমি স্নান করতে আসিনি, আমি শুধু তীরে দাঁড়িয়ে এই সব লোভনীয় দৃশ্য দেখতেই বুঝি এসেছি। যদিও সেখানে এত রকম মানুষের এত ভিড় যে এ রকম কথা নিয়ে চিন্তা করার কারুর সময় নেই, তবু আমার অস্বস্তি যায় না। আমি এই রকমই। এইসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আমি চিন্তা করি। আরও

হাজারটা লোক ওখানে মেয়েদের পোশাক বদলানো কিংবা নগ্ন বুক দেখছে, কিন্তু আমি লজ্জায় সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হলাম।

এবার ঊর্মি আর রজত উঠে এলো। ভিজে শাড়ী ও ভিজে চুলে অপূর্ব দেখাচ্ছে ঊর্মিকে। ওর সমস্ত শরীরের রেখাগুলি ফুটে উঠেছে—আমি সেদিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকি অনায়াসেই, আমার লজ্জা করে না। কারণ ঊর্মি আমার।

ঊর্মি আমার দিকে দৌড়ে এসে বললে, তুমি নামলে না, দেখতে তোমার খুব ভালো লাগতো।

—আর একটু ভিড় কমুক। দুপুরের দিকে নামবো।

—আর নেমেছো!

—তুমি তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে নাও। শীত করছে না?

—এখন আর একটুও শীত করছে না। আরও অনেকক্ষণ জলে থাকতে পারতাম। তোমার কথা ভেবেই উঠে এলাম।

—ভালোই করেছো।

রজতের বোধহয় কানে জল ঢুকেছে, তাই সে লাফালাফি করে জলটা বার করবার চেষ্টা করছে। বিরাট লম্বা চেহারা, সুন্দর স্বাস্থ্য, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—বহু নারী-পুরুষ তাকিয়ে দেখছে রজতের দিকে।

রজত আমাকে হাসতে হাসতে বললো, এত ভালো স্নান করেছি যেসব পাপ টাপ ধুয়ে গেছে বুঝলে? তুমি কিন্তু পাপীই রয়ে গেলে।

আমি বললাম, দু একজন পাপী না থাকলে পৃথিবীটা বড্ড বাজে জায়গা হয়ে যাবে।

ঘরে ফিরে এসে ওরা দু'জন পোশাক টোশাক বদলে নিল। তারপর আমরা চায়ের সন্ধানে বেরুলাম। চা-টা খেয়ে কপিলমুনির আশ্রমটা দেখে, মেলার দোকানপাট ঘুরে আবার ফিরে এলাম ঘরে। রজতের ইচ্ছে এবার একটা ঘুম দেওয়া।

দিনের বেলা বিশেষ কিছু করার নেই। আমাদের ফেরার কথা

ছিল বিকেলে। কিন্তু খাবার খেতে গিয়েই আমরা একটা খবর পেয়ে গেলাম। স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যানের জন্য একটি লঞ্চ তক্ষুণি ছাড়বে। রজতের সঙ্গে ও'র পরিচয় আছে, আমাদের তিনজনের জায়গা হয়ে যেতে পারে সেখানে। লঞ্চটা এখান থেকে সরাসরি কলকাতা পর্যন্ত যাবে, সুতরাং এটাতে ফেরা অনেক সুবিধের। রজত কথা বলে এলো। আমরা একটা হোটেল দেখে খুব তাড়াতাড়ি ডাল ভাত মাছের ঝোল খেয়ে নিলাম। এখানে আর থাকার কোন মানে হয় না, যা দেখার তো হয়েই গেছে।

সাগরদ্বীপে কোনো জেটি-ঘাট নেই, জোয়ারের জল কখন কতদূর পর্যন্ত আসবে তার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সুতরাং স্টীমার বা লঞ্চ একেবারে পাড়ের কাছে ভিড়তে পারে না। নদীর ওপরে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, সে পর্যন্ত নৌকো করে যেতে হয়।

তখন ভাঁটার সময়। পারের কাছে থকথকে কাদা, সেই কাদা ভেঙে গিয়ে উঠতে হবে খেয়ার নৌকোতে। আমরা জুতো খুলে হাতে নিয়ে প্যান্ট গুটিয়ে কোনক্রমে এসে নৌকোয় উঠলাম। অনেকেই ফেরার জন্য ব্যস্ত বলে খেয়া নৌকোগুলিতে এখন দারুণ ভিড়। মাঝিরাও পয়সার লোভে অত্যধিক যাত্রী তোলে। প্রায়ই ছোটোখাটো দুর্ঘটনা হয়।

আমাদের নৌকোতেও একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। এবং রীতি-মতো নাটকীয়।

ছটফটে স্বভাব রজতের। সে নৌকোয় মাঝিদের ওপর হম্বি-তম্বি করতে লাগলো, এক্ষুনি নৌকো ছাড়ো।

মাঝিরা আরও লোক তুলছে। অনেক লোক হাঁটু-জলে এসে দাঁড়িয়ে নৌকোয় ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের নৌকোটা বিপজ্জনক ভাবে ভর্তি হয়ে গেল। রজত ধমকাতে লাগলো সেই জন্য।

নৌকোটা ছাড়ার পর একটুখানিক মাত্র এগিয়েছে, এই সময় হঠাৎ সেটা থেমে গেল একদিকে। এই সময় মাথা ঠান্ডা করার বদলে

লোকে আরও ঝটাপটি শুরু করে। মাঝিরা সামাল সামাল বলার আগেই নৌকো কাৎ হয়ে দু'তিনজন পড়ে গেল জলে। তাদের মধ্যে ঊর্মিও আছে।

আমি সেটা দেখতে পেলেও চঞ্চল হই নি। সেখানে ভয়ের কিছু নেই, বড় জোর বুক-জল। কেউই সেখানে ডুববে না নৌকোটা ঠিক রাখতে পারলে ওদের ঠিকই টেনে তোলা যাবে। কিন্তু সেই চেষ্টা করার বদলে সবাই দারুণ চিৎকার করে বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে বসলো।

সামান্য ব্যাপারকেও অতি নাটকীয় করে তুলতে চায় রজত। ঊর্মি জলে পড়ে যেতেই ওর মাথার ঠিক রইলো না। মধ্যযুগীয় নাইটদের মতন বিপন্না নারীকে উদ্ধার করার জন্য ও তৎক্ষণাৎ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। প্রবল বিক্রমে ও নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে।

আসল বিপদটা রজতই বাধালো। ওর অত বড় শরীর নিয়ে লাফিয়ে পড়ায় পায়ের ধাক্কায় নৌকোটা ছিটকে চলে গেল দূরে, টালমাটাল হয়ে গেল, উল্টো দিক থেকে আরও কয়েকজন টুপটাপ করে গাছ-পাকা ফলের মতন পড়তে লাগলো জলে। আমি পড়ে যাচ্ছিলাম, সামলে নিলাম কোনক্রমে। তাকিয়ে দেখি, একটি ন'দশ বছরের ছেলে বসেছিল আমার পাশে, সে সেখানে নেই। জলের মধ্যে ছেলেটা খাবি খাচ্ছে।

আমি ঊর্মির জন্য চিন্তা করলাম না, কারণ ও যেখানে পড়েছে প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু এই ছেলেটি সম্পর্কে সে কথা বলা যায় না। এখানে জল গভীর, ওর পক্ষে তো বটেই। আমি খুব সাবধানে ঝাঁপ দিলাম নৌকো থেকে।

আশে পাশে আরও বেশ কিছু নৌকো এবং অনেক মানুষজন ছিল। তাদের কোলাহলে জায়গাটা রীতিমত সরগরম হয়ে উঠলো। একে তো নৌকো থেকে মানুষ পড়ে যাওয়াই যথেষ্ট উত্তেজক দৃশ্য, তার ওপর দু'জন সমর্থ চেহারার পুরুষ যদি একটি যুবতী ও একটি বালককে উদ্ধারের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা হলে ব্যাপারটা তো

আরও রোমাঞ্চকর হবেই।

অবশ্য, বালক-উদ্ধারের চেয়ে যুবতী-উদ্ধারই যে বেশী মনযোগ আকর্ষণ করবে, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঊর্মিকে রজত যখন নৌকোয় তুললো তখন বহু হাত এগিয়ে এলো সেদিকে। আমি ছেলেটিকে ধরতে পারছিলাম না, একটা চলন্ত লঞ্চের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সে ওলোট-পালোট খাচ্ছিল, আমি তাকে দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরে বুক-সাঁতার কেটে নিয়ে এলাম নৌকোর কাছে। ছেলেটির মা তখন হাউ হাউ করে কাঁদছিল।

যাই হোক, ইতিমধ্যে আর একটি নৌকো এগিয়ে এসেছিল আমাদের সাহায্যের জন্য। যাত্রীদের ভাগ করে দেওয়া হলো দুটো নৌকোয়। পূর্বের নৌকোয় মাঝিদের রজত তখন মারধোর করতে শুরু করছে। আমি মাঝখানে এসে থামালাম।

ঊর্মির মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! সে সব সময় হাসিখুশী থাকে, কোনো অসুবিধেই গ্রাহ্য করে না—কিন্তু হঠাৎ জলে পড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঊর্মি, তোমার লাগে টাগে নি তো কোথাও?

ঊর্মি মাথা নাড়িয়ে জানালো, না। মুখে কিছুই বললো না।

আমি ওকে চাঙ্গা করার জন্য বললাম, কি, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে বুঝি? বেশ তো একটা অ্যাডভেঞ্চার হলো।

ঊর্মি চুপ করে রইলো।

ভিজে জামাকাপড়েই আমরা লঞ্চে এসে উঠলাম। এটা সরকারী লঞ্চ, এতে অন্য যাত্রী নেওয়া হবে না—কয়েকজন মাত্র সরকারী অফিসার, আর আমরা তিনজন। প্রচুর জায়গা আছে।

আমি ঊর্মিকে বললাম বাথরুমে গিয়ে জামাকাপড় বদলে নিতে। তারপর আমরা খাবো। কিন্তু ঊর্মি কোনো উৎসাহ দেখালো না। ঠকঠক করে কাঁপছে, ঠোঁট বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবুও ভিজে কাপড় বদলাতে চাইছে না।

আমি একরকম জোর করেই ঊর্মিকে বাথরুমে পাঠালাম। এ

ঘটনাকে এত গুরুত্ব দিচ্ছে কেন উর্মি? এর মধ্যে কি আছে? প্রায় তীরের কাছেই নৌকো থেকে জলে পড়ে যাওয়া তো একটা হাসিরই ব্যাপার।

রজত গম্ভীর হয়ে গেছে যেন। উর্মি বাথরুমে যাবার পর রজত বিস্মিত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বিভাস, তুমি তাহলে সাঁতার জানো।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তো ছেলেবেলা থেকেই সাঁতার জানি। কেন, কি হয়েছে?

—আমার ধারণা ছিল না।

—কি ধারণা ছিল না?

—আমি ভেবেছিলাম, তুমি সাঁতার জানো না, তুমি জলকে ভয় পাও। সেই আগে একদিন গঙ্গায় নৌকোতে উঠে তুমি যে রকম কথা বলেছিলে, কিংবা আজ সকালে স্নান করতে চাইলে না—

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, তীর্থস্নানে এসে স্নান করা বোধহয় আমার নিয়তিতে লেখা ছিল। আমি স্নান করতে না চাইলেও পাকে-চক্রে ঠিকই হয়ে গেল।

রজত হাসলো না। একটু লজ্জিত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি বুঝতে পেরেছি ঠিকই, রজত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। উর্মি আমার বান্ধবী, সে বিপদে পড়লে আমারই উদ্ধার করতে যাওয়ার কথা। আমি অপারগ হলে অন্য কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু রজত আমাকে কোনো সুযোগই দেয় নি, সে আগে থেকেই সিনেমার হীরোর মতন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আমিও যদি বাচ্চা ছেলেটির জন্য ঝাঁপিয়ে না পড়তুম, তাহলে সকলে আমাকে কাপুরুষ ভাবতে পারতো। আমি অবশ্য সে সব কথা চিন্তা করে জলে নামি নি।

আমি রজতের মনের কুয়াশা কাটিয়ে দেবার জন্য আবার হেসে উঠলাম। এটা এমন কিছু গুরুত্ব দেবার মতন ব্যাপার নয়। এ রকম হতেই পারে। কখনো কখনো হয়ে যায়।

কিন্তু ফেরার পথে সমস্ত সময় রজত আর উর্মি কেউই সহজ হতে পারল না।

॥ ৫ ॥

গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার পর কিছুদিন আমি আমার বোনের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত হয়ে রইলাম। উর্মির সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা সম্ভব হয় নি। অর্থাৎ আমি ওদের বাড়িতে যেতে পারি নি।

হঠাৎ একদিন খেয়াল হলো, উর্মি তো আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকদিন আসে নি। ও তো অনায়াসেই আসতে পারে। আগে যেমন এসেছে।

আমার বোন ঝর্ণাও আমাকে একদিন বললো, সেজদা, তোমার সঙ্গে উর্মির কি ঝগড়া হয়েছে?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন রে?

—অনেকদিন আসে না তো!

—ভেবেছে বোধহয় কাজের বাড়ি, সবাই খুব ব্যস্ত থাকবে।

—আহা, উর্মিদি এলে বুঝি কাজের ক্ষতি হবে?

—আসবে নিশ্চয় দু'একদিনের মধ্যে।

—পরশুদিন নিউমার্কেটের কাছে উর্মিদির সঙ্গে দেখা হলো। কি রকম যেন গম্ভীর গম্ভীর দেখলাম। সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোক ছিলেন, খুব লম্বা, মাথায় বড় বড় চুল—উর্মিদিকে আসতে বললাম বাড়িতে, খুব একটা উৎসাহ দেখালো না।

আমার মনে হলো ঝর্ণা বোধহয় উর্মির নামে কিছু একটা নালিশ করতে চাইছে। এর প্রশ্রয় দিতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রসঙ্গটা বদলে ফেলে বললাম, তোর ফার্নিচারের অর্ডার দিতে যাবো আজ। তুই পছন্দ করে নিতে যাবি তো আমার সঙ্গে?

ঝর্ণার কথাটা উড়িয়ে দিলেও উর্মির কথাটা আমার মাথায় ঘুরতে

লাগলো। উর্মিকে বেশীদিন না দেখলে আমার কষ্ট হয়। ও যখন দিল্লীতে ছিল, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, উর্মিকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমিই ওকে কলকাতায় জোর করে ফিরিয়ে এনেছি। উর্মিকে দেখলে, উর্মি কাছে থাকলে আমার এই জীবনটা সত্যি সত্যি বেঁচে থাকার যোগ্য মনে হয়।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা গেলাম উর্মিদের বাড়িতে। কিন্তু ওকে পেলাম না! উর্মি দুপুরবেলাই কোথায় যেন বেরিয়েছে। উর্মির মা বললেন, ও নাকি হঠাৎ একটা চাকরির খোঁজার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু শুধু বাড়ীতে বসে থাকতে ওর ভালো লাগে না। ও চাকরী করবেই।

মেয়েদের চাকরি করার ব্যাপারটা আমার খুব একটা পছন্দ হয় না। আমি নারী-স্বাধীনতার বিরোধী নই। মেয়েরা যা খুশী সেটাই করতে পারে। কিন্তু চাকরি করাটা মোটেই একটা সুখের ব্যাপার নয়। আমরা চাকরি করি নিতান্ত বাধ্য হয়ে। সুতরাং যে মেয়েদের টাকা উপার্জনের প্রশ্নটা খুব বড় নয়, তারা শুধু সময় কাটাইবার জন্য চাকরি করতে যাবে কেন? সময় কাটাবার আরও কত ভালো উপায় আছে, গান-বাজনার চর্চা করা, অন্যদের নানা কাজে সাহায্য করা, কিংবা স্রেফ বই পড়া।

উর্মি যদি সত্যই চাকরি করতে চায়, আমি অবশ্যই তাতে বাধা দেব না। কিন্তু এ ব্যাপারে ওর প্রথমেই আমাকে বলাই তো ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। আমাকে কিছু জানালো না কেন? হয়তো উর্মি ভেবেছে, একেবারে একটা চাকরি যোগাড় করে ও আমাকে চমকে দেবে।

উর্মির মাকে কিছু না বলে আমি উঠলাম একটু বাদে। গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললাম একটু ধর্মতলা ঘুরে যেতে। ওখান থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যেতে হবে।

এলগিন রোডের কাছে ঠিক আমার গাড়ির পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল একটা মোটরসাইকেল খুব আওয়াজ তুলে। রঙীন

জামা পরা রজত, হাওয়ায় উড়ছে তার লম্বা চুল। তার পেছনে যে মেয়েটি বসে আছে তার মুখ দেখতে না পেলেও উর্মিকে চিনতে আমার ভুল হয় না। উর্মির শুধু পিঠ বা হাত বা শরীরের যেকোন অংশ দেখলেই বোধহয় আমি চিনতে পারি।

ওরা আমাকে দেখতে পায় নি। প্রায় চোখের নিমেষেই বাঁ দিকে বেঁকে গেল, উর্মিদের বাড়ির দিকেই। হয়তো রাস্তায় কোথাও উর্মির সঙ্গে রজতের দেখা হয়ে গিয়েছিল, রজত ওকে বাড়িতে পেঁছে দিচ্ছে। আজকাল ট্রামে-বাসে যা ভিড়, একা কোনো মেয়ের পক্ষে ট্যাক্সিতে ঘোরাও তেমন নিরাপদ নয়—সুতরাং রজত ওকে পেঁছে দিয়ে উপকারই করছে। অনেক মেয়ে মোটরবাইকের পেছনে চাপতে ভয় পায়—কিন্তু উর্মি এইসব উত্তেজনাই বেশী পছন্দ করে।

আজ রাত হয়ে গেছে, আজ আর উর্মিদের বাড়িতে এখন গিয়ে দরকার নেই। কাল গেলেই হবে। তা ছাড়া উর্মি যখন বাড়িতে গিয়েই শুনবে যে আমি এসেছিলাম।

ধর্মতলার দিকে খানিকটা এগিয়েই আমি হঠাৎ রোকুকে রোকুকে বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। ড্রাইভার ফিরে তাকাতেই আমি বললাম, গাড়ি ঘোরাও।

ড্রাইভার একটু বিস্মিত হয়ে গাড়ি ঘোরাতে শুরু করলো। রাস্তার ওপরে এরকম ভাবে গাড়ি ঘোরানো শক্ত। তবু যেন আমার জেদ চেপে গেল যে এক্ষুনি উর্মির সঙ্গে দেখা করতে হবেই। না দেখা করে চলবেই না।

কিন্তু একটু বাদেই আমার লজ্জা করতে লাগলো। এক্ষুনি উর্মিদের বাড়ি থেকে এসেছি, আবার এর মধ্যেই ফিরে যাবো? বাড়ির সকলে কি ভাববে? আমার চরিত্রে তো এ রকম আবেগের বাড়াবাড়ি থাকার কথা নয়।

সুতরাং আমি ড্রাইভারকে আবার বললাম, থাক, ওদিকে আর যাবার দরকার নেই। আবার ঘোরাও, ধর্মতলার দিকেই চলো।

ড্রাইভার আগে কখনো আমার এমন অস্থিরচিত্ততার প্রমাণ

পায় নি। সে রীতিমতন অবাক হয়ে বার বার চোরা চাহনি দিতে লাগলো আমার দিকে, মুখে কিছু বললো না যদিও। আমি নিজেও নিজের ব্যবহারে অবাক হচ্ছিলাম।

মানুষের জীবনে কতকগুলো বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত আসে, যখন একটি কথা বা একটি সিদ্ধান্তে সবকিছু বদলে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় সেই বিশেষ মুহূর্ত এসে পড়লেও ঠিক চেনা যায় না। অথবা মনঃস্থির করতে করতেই সেই সময়টা পেরিয়ে যায়। আমারও বোধহয় সেইরকম কিছুই হয়েছিল।

কয়েকদিন পরেই ঊর্মির সঙ্গে হঠাৎ আমার দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল। এর আগে আমরা পরস্পরকে একটাও কঠিন কথা বলি নি পর্যন্ত। আমাদের দু'জনের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু সেদিন আমরা দুজনেই মেজাজের সংযম হারিয়ে ফেললাম!

আমি ঊর্মির বাড়ি থেকে ফিরে আসবার পরদিনও ঊর্মি আমাদের বাড়িতে আসে নি। ব্যাপারটাতে বেশ খটকা লেগেছিল আমার। ঊর্মি তো এ রকম ব্যবহার কখনো করে না।

ঊর্মির সঙ্গে দেখা হবার আগেই রজতের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রজতের ব্যবহার স্বাভাবিক। সে কথায় কথায় জানালো যে ঊর্মি একদিন ওদের কাগজের অফিসে এসেছিল। কখনো তো কাগজের অফিস দেখে নি, সেই কৌতূহলে। রজত ওকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে রোটারি মেশিন, টেলিপ্রিন্টার, ব্লক কি করে তৈরি হয় এই সব। তারপর কফি হাউসে নিয়ে গিয়ে কফি খাইয়ে নিজের মোটরবাইকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।

ঊর্মি সেদিনই কথায় কথায় রজতকে বলেছে যে সে একটা চাকরি চায়। সে-ও কি খবরের কাগজের অফিসে চাকরি পেতে পারে না? মেয়েরা সাংবাদিক হতে পারবে না কেন? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তো অনেক নাম-করা মেয়ে-সাংবাদিক আছে।

রজত হাসতে হাসতে এই সব কথা বললো আমাকে। আমিও

হাসলাম। রজত আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললো, বিভাস, তুমি খুব লাকি। তুমি যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছো, সে খুব স্পিরিটেড গার্ল। দেখতে তো সুন্দর বটেই। কিন্তু শুধু রূপটাই বড় কথা নয়,—ওর চরিত্রে যে রকম তেজ আছে—

আমি খুশী হয়েছিলাম রজতের কথা শুনে। যে ঊর্মির প্রশংসা করে, সে আমার কৃতজ্ঞতা পায়।

ঊর্মিদের বাড়িতে সকালবেলা গিয়ে ওকে পেলাম। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার তোমার? পাত্তাই নেই যে?

ঊর্মি উল্টো অভিযোগ করে বললো, তুমিই তো আমার কোনো খোঁজখবর করো না। তুমি বোধহয় আজকাল আর আমাকে তেমন পছন্দ করো না, তাই না?

মেয়েদের একটা সুবিধে আছে, তারা যুক্তি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। তাই যে কোনো কথাই বলে দিতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, এসব আবার কি উল্টো-পাল্টা কথা?

ঊর্মি হাসলো না। মুখে তার অভিমানের হালকা ছায়া। মুখটা অন্যদিকে রেখে বললো, আমি খুব খারাপ হয়ে গেছি, তাই না? জানি, তুমি খুব ভালো, খুব মহৎ, আমি তোমার যোগ্য নই।

আমি একটু বিচলিত হয়ে ঊর্মির কাছে এসে ওর হাত ধরে বললাম, তুমি এসব কি বলছো, ঊর্মি? তোমার কি হয়েছে বলো তো?

—কিছু হয় নি।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, তুমি আমাকেও বলবে না?

—কি আবার বলবো?

—তুমি নাকি চাকরি খুঁজছো? হঠাৎ কেন?

—কেন মানে? আমার কি স্বাধীন ভাবে কিছু করার অধিকার নেই?

ঊর্মি এই কথাটা ঝাঁঝের সঙ্গে বললো বলেই আমি আঘাত

পেলাম। আমি কি উর্মির কোনো কাজে কখনো বাধা দিয়েছি?

আমি ধীর স্বরে বললাম, তোমার চাকরির দরকার হলে আমিই বোধহয় খুব সহজে তোমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম।

—যাক, তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি তো অনেক কিছুই করছো আমার জন্য।

—উর্মি, তুমি কি আজ আমাকে শুধু আঘাত দিয়েই কথা বলতে চাও?

—আমি কি তোমাকে আঘাত দিতে পারি? আমার কি সেটুকুও মূল্য আছে তোমার কাছে?

—উর্মি, তুমি জানো না, তোমার জন্য আমি—

—আমি সবই জানি। আমি তোমার কাছে একটা খেলনা মাত্র। যখন ইচ্ছে হবে, আমাকে নিয়ে খেলা করবে! যখন ইচ্ছে হবে না, তখন একবারও ভাববে না আমার কথা—তখন আমি বেঁচেই থাকি কিংবা মরেই যাই।

—উর্মি! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? এসব কি কথা।

—আমি ঠিকই বলছি। আমার জীবনের কোনো দাম আছে তোমার কাছে? আমি নৌকো থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, তুমি আমার দিকে হাতটাও বাড়িয়ে দাও নি। তুমি গ্রাহ্যও করো নি।

আমার হাসি পেল। উর্মি সেই ব্যাপারটা নিয়ে এতখানি অভিমান করেছে? ছেলেমানুষ আর কাকে বলে!

হাসতে হাসতেই বললাম, জলে পড়ে গিয়ে তুমি এত ভয় পেয়েছিলে? তুমি কি ভেবেছিলে, তুমি মরে যাবে?

উর্মি শুকনো গলায় বললে, মরে গেলে যেতাম! কি আর হতো!

—আরে দূর! ওখানে তো মাত্র বুক-জল, ওখানে কি কেউ ডোবে নাকি!

—আমার নিশ্বাস আটকে আসছিল—আর একজন ঝাঁপিয়ে পড়লো—তবু—

—আরে এটা তো একটা সামান্য ব্যাপার।

—তোমার কাছে তো সামান্য হবেই।

আমি চুপ করে গেলাম। রজত যে আমাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে আগেই নিজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এটা বলতে গিয়েও আমার জিভ আটকে গেল। আড়ালে কোন বন্ধুর নিন্দে বা সমালোচনা করা আমার পছন্দ হয় না। রজত একটা কৃতিত্ব দেখাতে চেয়েছিল, তাতে কি আর এমন ক্ষতি হয়েছে!

উর্মির দাদা-বৌদি দিল্লীতে চলে যাবার ফলে এ বাড়িটাতে এখন লোকজন বিশেষ নেই। উর্মির বাবা অনেকদিন আগেই মারা গেছেন, ওর মা আছেন দোতালায়। একতলার বসবার ঘরে শুধু আমি আর উর্মি। একটা জাম রঙের শাড়ি পরে উর্মি বসে আছে দূরের সোফায়। আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। খুবই রেগে আছে মনে হচ্ছে। গঙ্গাসাগরের ব্যাপারটায় যে এত গুরুত্ব থাকতে পারে, তা আমি কল্পনাই করতে পারি নি। এই সুন্দর সকালবেলাটা ঝগড়া করে কাটাবার কোনো মানে হয় না।

আমি বললাম, তুমি রজতের অফিসে গিয়েছিলে? কেমন লাগলো খবরের কাগজের অফিস?

উর্মি বললো, আমি ওদের অফিসে গিয়েছিলাম? কে বললো তোমাকে?

—কেন তুমি যাও নি?

—না।

আমি এবার ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, এর মধ্যে রজতের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি বলতে চাও?

উর্মি কঠোর মুখ করে আবার বললো, না।

হঠাৎ আমার রাগ হয়ে গেল। উর্মি তো কখনো এরকম ছিল না। এরকম ভাবে বদলে গেল কি করে! মিথ্যে কথা বলা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। রজতের সঙ্গে উর্মি দেখা করলে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু ও সে কথা আমার কাছে গোপন করবে

কেন ?

আমি জোর দিয়ে বললাম, আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি রজতের মোটরসাইকেলের পেছনে চেপে আসছো।

ঊর্মি ব্যঙ্গের সুরে বললো, তাই নাকি ? তুমি নিজের চোখে দেখেছো ? যদি চেপেই থাকি, সেটা কি খুব অপরাধ ?

—মোটেই আমি বলি নি সেটা অপরাধ। তুমি নিশ্চয়ই দেখা করতে পারো কিন্তু তুমি সেটা গোপন করতে চাইছিলে কেন ?

—মোটেই আমি গোপন করতে চাই নি। আমি খুব ভালো ভাবেই জানি, তুমি দেখেছো। এলগিন রোডের কাছে, তোমার গাড়ির পাশ দিয়েই আমরা এলাম। তুমি কেন তখন আমাদের ডাকো নি ? কিংবা কেন গাড়ি ঘুরিয়ে আসো নি! আমরা একটু দূরে থেমে পড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তোমার মনে পাপ আছে, তাই তুমিই সেটা আগে গোপন করে আমাকে জেরা করতে চাইছিলে।

—ছিঃ ঊর্মি, তুমি আমাকে এ রকম ছোট ভাবলে ?

—তুমি বলো, তুমি প্রথমেই কেন বললে না আমাকে রজতের মোটরবাইকের পেছনে দেখেছিলে ? কেন জেরা করতে শুরু করলে ?

—একটা সাধারণ কথা জিজ্ঞেস করতে পারবো না ?

—এটা সাধারণ কথা ?

আর আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। এই সময় যদি প্রসঙ্গটা বদলাতে পারতাম কিংবা ঘরে অন্য কেউ এসে পড়তো, তাহলে সব ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে যেত। তার বদলে, আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, ধরা পড়ে গেছো কিনা, তাই এখন ঐ কথা বলছো! তুমি আমাকে না জানিয়ে রজতের অফিসে গিয়েছিলে ?

ঊর্মি অত্যন্ত জেদি মেয়ে। রাগের সময় ওর জ্ঞান থাকে না। আমাকে বাধা দিয়ে ও কথার মাঝখানেই বললো, শুধু ওর অফিসে কেন, ওর বাড়িতেও গিয়েছিলাম একদিন।

—ও, এতদূর! আমার বোন নিউমার্কেটের সামনেও তোমাকে

একদিন দেখেছে রজতের সঙ্গে।

—বেশ করেছি। আমার যেখানে খুশি, যার সঙ্গে খুশি যাবো। আমি কি খাঁচার পাখি ?

এর পর ঝগড়া চরমে উঠলো। আমি রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঊর্মির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। আসবার সময় বলে এলাম, তোমার যা খুশি করো। আর কোনোদিন আমি তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

ঊর্মির রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। একটা দিন কাটলেই ঊর্মির সঙ্গে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যেত। এর আগেও দেখেছি, দিনের বেলা ঊর্মি কারুর সঙ্গে ঝগড়া করলে সেদিন রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদবে। সকালবেলাই তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

কিন্তু এবার সে রকম হল না। আমি চলে যাবার একটু পরেই ঊর্মি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। সোজা গিয়ে উপস্থিত হলো রজতের ফ্ল্যাটে। জেদের বসে বললো, আমি আর কোথাও যাবো না। আমি এখানেই থাকব। আপনিও কি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন ?

রজত ঊর্মিকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করলো। রাগ করলো, ধমকালো, ঊর্মি তখনও কিছুই শুনবে না। তারপর রজত ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ওর পিঠে হাত ছোঁয়ালো। একবার স্পর্শের পর সব কিছু বদলে যায়। রজত তো বলেই ছিল, সে অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামায় না।

॥ ৬ ॥

ঠিক আটদিন পরে রজত এসে দেখা করলো আমার অফিসে। আমার একটা ছোট-খাটো ঘর আছে, সেটার দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রজত জিজ্ঞেস করলো, বিভাস, তুমি কি খুব ব্যস্ত ? আসতে পারি ?

রজতকে দেখেই আমি একটা ব্যাপারে মন ঠিক করে ফেললাম। অফিস থেকে আমাকে বোম্বেতে ট্রান্সফার করার কথা চলছিলো বেশ কিছুদিন ধরেই। সেখানে গেলে আমার চাকরিতে প্রমোশন হবে, সুযোগ-সুবিধেও অনেক বেশী পাবো। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে আমি কিছুতেই যেতে চাইছিলাম না।

রজতকে বললাম, তুমি এক মিনিট বসো। আমি ম্যানেজারের ঘর থেকে এক্ষুণি আসছি।

ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে বললাম, স্যার, আমি বম্বেতে যেতে রাজী আছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করুন।

ফিরে এসে দেখলাম, রজত ওর বুড়ো আঙুলের নখে অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট ঠুকছে।

আমি বললাম, কি ব্যাপার বলো? কফি-টফি খাবে?

রজত মুখ তুলে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। মুখটা দেখেই বোঝা যায় ওর মনের মধ্যে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব চলছে। রজত যদি কোনো বদমাইস লম্পট ধরনের মানুষ হতো তাহলে ওর কোনো অসুবিধেই ছিল না। ও ভদ্রলোক বলেই কষ্ট পাচ্ছে।

রজত বললো, তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা আছে। কিন্তু এখানে বসে ঠিক—তুমি কি একটু বেরুতে পারবে? খুব কাজ আছে?

আমি বললাম, আধ ঘন্টার মধ্যে সেরে নিতে পারি, যদি বসতে পারো।

—আমি বসছি।

আমি কাজ করতে লাগলাম। রজত চুপচাপ বসে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করতে লাগল।

তারপর এক সময় বেরুলাম। ড্রাইভারকে ছুটি দিয়ে নিজেই গাড়ীর স্টিয়ারিং-এ বসে বললাম, কোথায় যাবে?

রজত বললো, আমার ফ্ল্যাটেই সুবিধে। তোমার আপত্তি আছে?

—না, না, আপত্তি থাকবে কেন?

রজতের ফ্ল্যাটে আমি আগে দু'তিনবার এসেছি। ব্যাচেলারের ফ্ল্যাট, এখানে বন্ধুবান্ধবদের দারুণ আড্ডা হয়। আমি অবশ্য রজতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একজন নয়—আমার নিজের কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধুই নেই—ওদের তাস খেলা বা মদের আড্ডায় আমি সে রকম ভাবে যোগ দিতে পারি না।

আগের বার এসে ফ্ল্যাটটাকে অত্যন্ত অগোছালো দেখেছিলাম। এখন সেখানে যত্নের স্পর্শ আছে।

ঘরে ঢুকেই রজত টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ব্রান্ডির বোতল বার করলো, ঢকঢক করে চুমুক দিল খানিকটা। তারপর আমার দিকে বোতলটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, খাবে একটু?

আমি প্রত্যাখ্যান করলাম। মানসিক উত্তেজনা দমন করার জন্য রজতের ব্রান্ডির দরকার হয়, কিন্তু আমার হয় না।

দু'জনে দুটো চেয়ারে বসলাম। রজত ওর লম্বা চুলে চিরুনির মত আঙুল চালাতে চালাতে ক্লিষ্ট স্বরে বললো, কি ভাবে শুরু করবো, ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি জানো নিশ্চয়ই সব ব্যাপারটা?

আমি বললাম, শোনো রজত, তোমারও দোষ নেই, ঊর্মিরও দোষ নেই। আমি খুব ভালো করে ভেবে দেখেছি।

রজত বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ওরকম ভারিক্কি চালে কথা বলো না। তুমি মহত্ত্ব দেখাতে চেয়ো না কিংবা উপদেশও দিও না। আমরা দু'জন পুরুষমানুষ, প্র্যাকটিক্যাল হয়ে কথা বলতে হবে।

—ঠিক আছে, তুমিই বলো তাহলে!

—আমার যেটুকু বলার আগে বলে নিচ্ছি। তুমি আমার বন্ধু, তোমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, যার সঙ্গে তোমার বিয়ের সব ঠিকঠাক, তাকে কেড়ে নেবার মতন মনোবৃত্তি আমার নয়। কোনোরকম ছলছুতো করে আমার দিকে তাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টাও আমি করি নি।

—আমি জানি।

—আমাকে সবটা বলতে দাও। আমি ঊর্মির সঙ্গে সহজ

স্বাভাবিক ব্যবহারই করেছি। তোমাকে কোনরকম ভাবে ঠকাবার ইচ্ছেও আমার মাথায় কখনো জাগে নি। গঙ্গাসাগরে তোমরা আমার সঙ্গে গিয়েছিলে নিজেদের ইচ্ছেতেই। জল থেকে আমি ঊর্মিকে কোলে করে তুলে এনেছিলাম, সেজন্য কি তুমি কিছু মনে করেছিলে ?

—না।

—সেটাই স্বাভাবিক। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলে যে আমার সেই সময়কার ব্যবহার ক্যালকুলেটড কিছু না, একেবারে ইন্‌সটিংটিভ—তুমি যে সাঁতার জানো, সেটা আমার ধারণাতেই ছিল না।

—এ সম্পর্কে আর বেশী বলে লাভ কি ?

—এ ব্যাপারটিতে তুমি কোনো গুরুত্ব দাও নি। কিন্তু ঊর্মি দিয়েছে। ওর ধারণা হয়েছে, তুমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করো নি।

—ওখানো মরার প্রশ্নই ছিল না।

—হয়তো তাই। কিন্তু মেয়েরা ছোটো ব্যাপারকেও বড় করে দেখে। ওরা ওদের প্রতি মনোযোগের বাড়াবাড়িও পছন্দ করে। ওরা মেলোড্রামায় বিশ্বাসী। যাক্‌গে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি খুব ধীর স্থির শান্ত ধরনের মানুষ, তুমি অনেক সলিড এবং নির্ভর-যোগ্য, কিন্তু আবেগ আর উত্তেজনা তোমার মধ্যে কম। ঊর্মির স্বভাব সম্পূর্ণ উল্টো। সে ছটফটে, জেদী, খামখেয়ালী—

এখানে আমার হাসি পাবার কথা। রজত ঊর্মির চরিত্র বোঝাচ্ছে আমাকে—অথচ ঊর্মিকে ও দেখেছে মাত্র দু'তিন মাস। আর আমি ঊর্মিকে চিনি অন্তত এগারো বছর ধরে।

রজত বললো, তোমাদের মধ্যে মিল হওয়া খুব শক্ত ছিল। ঝগড়া হতোই—এখন না হোক বিয়ের পরে। সুতরাং এখন যে হয়েছে, সেটা এক হিসেবে ভালোই।

—এখন তোমাদের প্ল্যান কি ?

—তুমি জানো, আমার বিয়ে করার কোনো প্ল্যান ছিল না।

আমি বিয়ে টিয়ের কথা কখনো ভাবিই নি। কিন্তু ঊর্মি, মানে, সেদিন ঊর্মি আমার এখানে এসে পড়ল ঝড়ের মতন। কিংবা ওর যা নাম—একটা প্রকাণ্ড ঢেউ—আমার সব ধারণাটা মিথ্যে হয়ে গেল—মানে, একটা সিগারেটের বিজ্ঞাপনে যেমন লেখে, মেড ফর ইচ আদার—আমরা দু'জনে ঠিক তাই। আমরা পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছি।

হঠাৎ আমার মনে হলো, আমি এখানে চুপচাপ বসে আছি কেন ? এই রজত, এ আমার কাছ থেকে ঊর্মিকে কেড়ে নিচ্ছে, আমি কোনো বাধা দেবো না ? বছরের পর বছর ধরে যে ঊর্মিকে আমি আমার বুকের মধ্যে লালন করেছি, পৃথিবীতে যার চেয়ে সুন্দর আমি আর কারুকে দেখি না, সেই ঊর্মি ! একটা ঘুষিতে রজতের সব দাঁতগুলো ভেঙে ফেলা উচিত নয় আমার ?

তবু আমি স্থির হয়ে বসে রইলাম। রজত ঠিকই বলছে। ওর সঙ্গেই ঊর্মিকে ঠিক মানায়। রজত তো নিজে থেকে ঊর্মিকে গ্রাস করে নি। আমিই ওদের আলাপ করিয়ে দিয়েছি, ঊর্মি স্বেচ্ছায় এসেছে এখানে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঊর্মি কোথায় ?

—আসবে, আর একটু পরেই আসবে।

—আমি এইসব কথা ঊর্মির মুখ থেকে শুনতে চাই।

—ঊর্মি নিজের মুখে তোমাকে কিছুই বলতে পারবে না। ঊর্মি খুব ভেঙে পড়েছে। একদিন হঠাৎ রাগের মাথায় ঝগড়া করলেও তোমার সঙ্গে ওর এতদিনের সম্পর্ক, তা ছাড়া ও তোমাকে শ্রদ্ধা করে।

একদিন যেটা ছিল ভালোবাসা, আজ সেটা হয়ে গেল শ্রদ্ধা ? মাত্র একমাস আগেও ঊর্মি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে নি যে আমায় ছেড়ে ও বেশীদিন দূরে থাকতে পারে না ?

না, আমি ভুল করেছিলাম। ঊর্মির মুখ থেকে আমি কিছুতেই শুনতে চাই না যে সে আমাকে ভালোবাসে না। ওটা মরীচিকা

হয়েই থাক! ভালোবাসা তো কোন বন্ধন নয়। কোনো প্রতিশ্রুতিই বোধহয় সারা জীবন টেঁকে না। ঊর্মিকে আমি ভালোবেসেছি, তাকে বেঁধে রাখতে চাই নি তো কখনো।

রজত আবার বললো, বিভাস, আর একটা কথা তোমার কাছে বলতে আমার খুবই লজ্জা করছে। কিন্তু না বলে আমার উপায় নেই। এখন ঊর্মির চেয়ে আমিই যেন বেশী পাগল হয়ে উঠেছি বেশী। আমি বুঝতে পেরেছি, ঊর্মির মতন একজন মেয়েকেই আমি সারা জীবন ধরে খুঁজেছিলাম। ওকে না পেলে আমার চলবে না। ওকে না দেখলে আমি সারা জীবন অসম্ভব অতৃপ্ত থেকে যেতাম। আমি জানি, তোমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিচ্ছি আমি। এটা ভয়ঙ্কর স্বার্থপরতা। কিন্তু ভালোবাসার জন্য মানুষ এ রকম স্বার্থপরও হয়। তুমি আমাদের ক্ষমা করো। তুমি জীবনে সার্থক, তুমি জীবনে অনেক নারীর ভালোবাসা পাবে ; ঊর্মির চেয়েও অনেক ভালো কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ঊর্মি শুধু আমারই জন্য।

রজতের গলা আবেগে কাঁপছিল। যে-কোন লোকেরই সহানুভূতি হবে তার কথা শুনে। ঊর্মিকে সে তীব্র ভাবে ভালোবেসে ফেলেছে এখানে যেন আমার কোনো ভূমিকা নেই।

আমি রেগে উঠে রজতের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করলে সেটাই বোধহয় স্বাভাবিক হতো। কিন্তু আমরা একটা সভ্যতা সৃষ্টি করেছি। আমরা এখন আর কোনো নারীর জন্য মারামারি করি না। এখন সব দুঃখ বুকে চেপে রাখতে হয়।

রজত আবার চুমুক দিচ্ছে ব্রাণ্ডির বোতলে। আমি উঠে দাঁড়ালাম। খুব ধীর স্বরে বললাম, আমার দুটো শর্ত আছে। আমি চাকরিতে ট্রান্সফার নিয়ে শিগগিরই চলে যাচ্ছি বোম্বেতে। আমি কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে তোমরা বিয়ে করবে না। আর আমার বোনের বিয়ের আগে তোমাদের এই সম্পর্কের কথা যেন আর কেউ না জানতে পারে। সেই বিয়েতে তোমরা দু'জনেই নেমন্তন্ন

খেতে যাবে।

রজত উঠে দাঁড়ালো। আমার হাত ধরে বললো, তুমি যদি রাজী না হতে কিংবা রাগ করতে, তা হলে আমি কি করতাম জানো? আমি সেটাও আগে ঠিক করে রেখেছিলাম। আমি কারুকে কিছু না জানিয়ে, ঊর্মিকেও না জানিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতাম, আমার আর খোঁজ পেতে না। অবশ্য তাতে সমস্যা মিটতো কিনা আমি জানি না। হয়তো তাতে আমাদের তিনজনের জীবনই অভিশপ্ত হয়ে উঠতো।

আমি বললাম, না তার দরকার নেই। আমিই দূরে সরে যাচ্ছি। আমি তোমাদের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করবো না।

জানি, আমার এই কথাগুলো মহৎ মহৎ শোনাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, একটা কিছু তো বলতে হবে। এর চেয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আর কি বলা যায়!

রজত আমার হাতটা চেপে ধরে থেকেই জিজ্ঞেস করলো, নো হার্ড ফিলিংস?

আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম, না।

জোর করে একটু হাসিও ঠোঁটে ফোটালাম। তারপর পা বাড়ালাম দরজার দিকে।

রজত বললো, একি, এক্ষুণি চলে যাচ্ছো, আর একটু বসো, ঊর্মি ছ'টার মধ্যেই এসে যাবে। ওর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

—না, আমার অনেক কাজ আছে।

রজতের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আমি গাড়িতে বসে একটা সিগারেট ধরালাম আগে। আয়নায় দেখলাম নিজের মুখটা। কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন তো ঘটেনি। কেউ কি আমার মুখ দেখে বুঝবে, আজ থেকে আমার জীবনটা শূন্য হয়ে গেল?

গাড়িটা চালিয়ে সি আই টি রোডের বাঁক ঘোরার মুখেই আবার থামলাম। রজতের ফ্ল্যাটটা যেন চুম্বকের মতো আমাকে টানছে, ওটা ছেড়ে দূরে যেতে পারছি না। একটু পরেই ওখানে ঊর্মি আসবে।

গাড়ি থেকে নেমে বাইরে দাঁড়ালাম। এখান থেকেও রজতের ফ্ল্যাটটা দেখা যায়। রজত দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। অনবরত চুলের মধ্যে আঙুল বোলাচ্ছে। রজত প্রতীক্ষা করছে ঊর্মির জন্য। আমিও তাই। অথচ দু'জনের মধ্যে কত তফাত।

গঙ্গাসাগরে নৌকো উল্টে যাওয়ার ঘটনাটা আসলে কিছুই নয়। একটা নিমিত্ত মাত্র। জল থেকে তোলার সময় রজত ঊর্মিকে স্পর্শ করেছিল। সেই স্পর্শেই ঊর্মি বুঝেছে, এই রকম পুরুষকেই তার চাই। আমি ঊর্মির যোগ্য নই।

পর পর কটা সিগারেট শেষ করেছিলাম মনে নেই। এক সময় দেখলাম রজতের বাড়ির সামনে একটা ট্যাক্সি থামলো। তার থেকে নামলো ঊর্মি। একটা সাদা রঙের শাড়ী পরে আছে, মুখ-চোখ উদভ্রান্তের মতন। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

ঊর্মির সঙ্গে বস্তুত সেই আমার শেষ দেখা। আমি মনে মনে বললাম, ঊর্মি, আমি চিরকাল তোমায় ভালোবাসবো। আমার ভালবাসা দিয়ে তোমাকে সুখী করতে চেয়েছিলাম। তুমি সুখী হও। আমি তোমার সুখের জন্যই তোমাকে রজতের হাতে সমর্পণ করলাম।

॥ ৭ ॥

বম্বেতে বাড়ি ভাড়া যোগাড় করা খুব শক্ত, তাই প্রথমে এসে আমাকে উঠতে হলো একটা হোটেলে। সেখানে সময় কাটে না।

বম্বেতে ট্রান্সফারের কথা আর কারুকে আগে ঘুণাক্ষরেও জানাই নি। আমার বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পর বাড়িতে খবরটা প্রকাশ করে, ঠিক সেইদিনই ট্রেনে চেপে বসেছি। এখন কলকাতাতে নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে অনেক রকম আলোচনা এবং

জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। আমার আড়ালে যা খুশী তাই হোক।

কাজের মধ্যে সবসময় নিজেকে ডুবিয়ে রাখবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু কাজেরও তো একটা সীমা আছে। এক সময় না এক সময় একা থাকতেই হয়, তখনই রাজ্যের চিন্তা মাথায় ভিড় করে। ঊর্মির ছবিটা বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আমি সেটা তাড়াবার জন্য তক্ষুণি চলে যাই কোনো সিনেমা দেখতে। যে কোনো আজেবাজে সিনেমাই হোক না কেন।

বিছানায় শুয়ে শুয়েও আমি যেন সিনেমা দেখি। স্পষ্ট দেখতে পাই ঊর্মি আর রজত হাত-ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে। কিংবা রজত মোটর সাইকেলে স্টার্ট দিচ্ছে। ঊর্মি বসেছে পিছনে! মোটরসাইকেলটা গর্জন করে সাঁ করে বেরিয়ে গেল। পত পত করে উড়ছে ঊর্মির আঁচল। সমস্ত শব্দ ভেদ করেও আমি শুনতে পাই ওদের দু'জনের মিলিত হাসির শব্দ।

সেই সময় বিছানা থেকে উঠে আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিই।

আমি কলকাতা ছেড়ে চলে আসার পরে কয়েকটা দিন ঊর্মি আর রজতের কি ভাবে কেটেছিল, তা অনেকটা আমি এই রকম স্বপ্নে দেখেছি, অনেকটা শুনেছি পরে লোকমুখে। সবই আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেছে।

আমি কলকাতা ছাড়বার পর ঊর্মি যখন রজতকে বিয়ে করার কথা বলেছিল, তখন হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল ওর বাড়িতে এবং চেনাশোনা আত্মীয়-মহলে। সকলের কাছেই ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল।

আমার পলায়নের ফলে সকলেই ধরে নিয়েছিল যে ঊর্মির সাথে আমার কিছু একটা গুরুতর গণ্ডগোলই ঘটেছে, কিন্তু পাত্র হিসাবে রজতকে কারুরই পছন্দ হয় নি। সাধারণ সংসারী লোকেরা রজতের মতন ছেলেকে সুনজরে দেখে না। তার লম্বা-চওড়া চেহারা অন্যদের কাছে মনে হয় 'গুণ্ডার মতন'। সে একটা মাঝারি চাকরি করে বটে, কিন্তু সে উচ্ছৃংখল, বাউণ্ডুলে। তার বিষয়-সম্পত্তি নেই, জমানো

টাকা নেই, প্রকাশ্যে মদ খায়, নারীঘটিত অনেক কাহিনী আছে তার নামে। তার উপরে একেবারেই নির্ভর করা যায় না।

উর্মিকে অনেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছিল, তাকে আবার পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল দিল্লীতে। কিন্তু অন্য কারুর কথায় যে সে মত বদলাবে না, তা আমি অন্তত খুব ভালো করেই জানি। উর্মি যখন আমাকে ছাড়তে পেরেছে, তখন আর কারুকেই সে গ্রাহ্য করবে না।

উর্মির দাদা সুকোমল বম্বে পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফিরিয়ে নেবার জন্য। সুকোমল ভেবেছিল উর্মির সঙ্গে আমার সাধারণ ঝগড়া বা মান-অভিমান হয়েছে, আর একবার দু'জনের দেখা করিয়ে দিতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি সুকোমলকে খুব শান্ত ভাবে বুঝিয়ে বললাম যে আমি উর্মির ভালোর জন্যই ওকে ছেড়ে এসেছি। রজতের সঙ্গেই ওর স্বভাবের মিল হবে, রজতকে ওই সত্যিকারের ভালো বাসতে পারবে।

সুকোমল বললো, এটা ভালোবাসা নয়, এটা একটা সাময়িক মোহ।

—কিন্তু উর্মির চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, সে বুঝবে না কোনটা মোহ কোনটি ভালোবাসা।

—মেয়েরা অনেক বয়েস পর্যন্ত ছেলেমানুষ থাকে। ওরা নিজেদের সম্পর্কে কিছুই বোঝে না।

—তবু ও যদি ভুল করতে চায়, তুই-আমি বাধা দেবার কে? জীবনটা তো ওর নিজেরই!

—তা হলে ও যদি এ রকম একটা ভুল করে আমি দাদা হয়েও তাতে বাধা দেব না?

—এসব ক্ষেত্রে বাধা দিয়েও কোন ফল হয় না। তুই রজতের সঙ্গে দেখা করেছিস?

ওরে বাবা, সে তো একটা গুন্ডা। তার ভাব-ভঙ্গি দেখলে মনে হয়, আমরা কোনো আপত্তি করলেও সে উর্মিকে কেড়েই নিয়ে

যাবে। অবশ্য এসব লোককে কি করে ঠাণ্ডা করতে হয় আমি জানি।

—সুকোমল, তুই ভুল করছিস। রজত মোটেই গুন্ডা নয়, তার অনেক গুণ আছে। ওকে বিয়ে করলে, উর্মি সুখীই হবে। এ বিয়ে হবেই মাঝখানে তোরা বাধা দিয়ে ব্যাপারটাকে তেতো করে তুলিস না।

কলকাতায় ফিরে যাবার আগে সুকোমল আমার দিকে একটা ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে বলে গেল, তুই যে এত কাপুরুষ, তা আমি জানতাম না। তুই এত সহজে ছেড়ে দিলি? নিজের বোন বলে বলছি না, উর্মিকে ছেড়ে দিয়ে তুই বিরাট ভুল করলি।

আমি সে কথার কোনো উত্তর দিই নি।

আমি আগেই শুনেছিলাম, রজত আনুষ্ঠানিক মন্ত্র-পড়া বিয়েতে রাজী নয়। ওরা রেজিস্ট্রী করবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া। আমি মনে মনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, নির্দিষ্ট দিনে, রজতের ফ্ল্যাটে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এসেছে। মাঝখানে গম্ভীরমুখ প্রৌঢ় রেজিস্ট্রার। দু'একটা শপথবাক্য এবং কয়েকটা সই—হয়ে গেল বিয়ে। সারা জীবনের অঙ্গীকার। এখন থেকে উর্মি সামাজিক ভাবে রজতের।

এর পর খাওয়া-দাওয়া। উর্মি কি নববধূর মতন লজ্জাশীলা? না সহজ স্বাভাবিক ভাবে সকলকে খাদ্য পরিবেশন করছে? সেটাই যেন উচিত। রজতও ঘুরে ঘুরে সকলকে জিজ্ঞেস করলো, আর একটা ফিশ-ফ্রাই নেবেন না? একটু দই?

ওখানে আমার কথা একবারও কি কারুর মনে পড়েছে?

বিয়ের পর হনিমুন। আমি উর্মিকে কাশ্মীরে নিয়ে যাবো বলেছিলাম। রজত অত দূরে যাবে না। রজত খুব পাহাড় ভালোবাসে। খুব সম্ভবত দার্জিলিং।

দার্জিলিং-এ রজত আর উর্মি। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। জলাপাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। দারুণ খুশীতে উজ্জ্বল দুই তরুণ-তরুণী। কি সুন্দর মানিয়েছে ওদের। ওরা হাত ধরাধরি করে

দৌড়াচ্ছে। কাছাকাছি আর কেউ নেই। ওরা কি বুঝতে পারছে যে হাজার মাইল দূর থেকে ওদের আমি দেখছি?

ঘোড়া ভাড়া করেছে রজত। ঊর্মিকে ঘোড়ায় চড়া শেখাচ্ছে। ঊর্মি একটুও ভয় পাচ্ছে না। হাসিতে দুলে দুলে উঠছে ওর শরীর।

রজত আর ঊর্মি পাশাপাশি দুটো ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে কালিম্পংয়ের দিকে। যেন সে যুগের এক রাজকুমার আর রাজকুমারী।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেছে। ভিজে যাচ্ছে ঊর্মি। ইস, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়!

ওরা দু'জন বাচ্চা ছেলেমেয়ের মতন ছুটে ছুটে আসছে হোটেলের দিকে। উঠে গেল হোটেলের দোতলায়। ঊর্মির খুব শীত করছে এখনো। রজত ওর হাত হাতে ঘষে গরম করে দিচ্ছে।—

রজত সাংবাদিক, কত লোকের সঙ্গে চেনা। দার্জিলিংয়েও অনেক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ম্যালের কাছে রজতের দু'জন বন্ধু, তারা শিলিগুড়ি থেকে মোটর সাইকেলে এসেছে বেড়াতে। একজনের মোটর সাইকেলে কি যেন একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

মোটর সাইকেলটা রজতের নেশার মতন। ঊর্মিকে দাঁড় করিয়ে রেখে রজত তার বন্ধুর মোটর সাইকেল সারাচ্ছে! এই তো ঠিক হয়ে গেল। রজতের মুখে সাফল্যের হাসি।

রজত ঊর্মিকে বলছে, তুমি একটু দাঁড়াও, আমি মোটরসাইকেলটা একটু ট্রায়াল দিয়ে আসি।

স্টার্ট দিয়ে রজত সেটা নিয়ে দুরন্ত গতিতে বেরিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায় না শব্দ।

নাঃ, কত আর ছবি দেখাবো। আবার দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলাম। আঃ, ঘুম কি কিছুতেই আসবে না?

মাঝরাত্রে কিসের একটা আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজ, না কে যেন ধাক্কা দিল আমার মাথায়? কে যেন আমাকে

ধাক্কা দিতে দিতে ব্যাকুল গলায় বললো, বিভাস ওঠো ওঠো!

কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঘরের দরজা বন্ধ, কে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাবে? উঠে আলো জ্বাললাম। দরজা বন্ধই আছে। ঘরে, কেউ নেই। তবে, আমার সুটকেসটা একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখা ছিল, সেটা পড়ে গেছে নীচে। সেই শব্দেই বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। সুটকেসটা পড়লো কি করে? হয়তো আমার পায়ের ধাক্কা লেগেছে ঘুমের মধ্যে। যদিও ওটা বেশ দূরে—

না, আসলে আমার ঘুম ভেঙেছে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। ওঃ কি বিশ্রী স্বপ্ন। আমি দেখলাম, দার্জিলিংয়ের পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে দারুণ স্পীডে মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটে আসছে রজত। পাশেই খাদ। তবু দুঃসাহসী রজত সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে ব্র্যাণ্ডির বোতল বার করে চুমুক দিতে গেল···এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরা···একি করছে রজত, হঠাৎ হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গেল কিংবা চাকা স্কিড করলো —মোটরবাইক শুদ্ধু রজত গড়িয়ে পড়ছে খাদে, অনেক অনেক নীচে—

না, না, না, এ হতেই পারে না। অসম্ভব! অসম্ভব!

॥ ৮ ॥

ঊর্মিকে যখন আমি আবার দেখলাম, তখন তাকে মানুষ না বলে একটি ধ্বংসস্তূপই বলা যায়। দেহে প্রাণ আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে, শরীরে ঠিক মতন রক্ত-চলাচল করছে, শুধু আলোটুকুই নেই? সেই ঊর্মিকে যেন চেনাই যায় না। সর্বক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকে। কাঁদে না, দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সব সময় কি যেন ভাবে।

সেই দুঃস্বপ্ন দেখার পরের দিনই আমি টেলিগ্রামে রজতের দুর্ঘটনার খবর পেয়েছিলাম। আমি যে রকম দেখেছিলাম, প্রায়

সেই রকম ভাবেই খাদে পড়ে গিয়ে রজত মারা গেছে। তার শরীরটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল।

টেলিগ্রামটা পেয়ে আমি কেঁদেছিলাম। রজত আমার বন্ধু ছিল, অনেকখানি বড় প্রাণ ছিল তার, সেই প্রাণের একি অপচয়! ঊর্মির কথা ভেবেও আমি কান্না থামাতে পারি নি অনেকক্ষণ। ঊর্মি জীবনে সুখ চেয়েছিল, রজত কেন তাকে এরকম ভাবে বঞ্চিত করে চলে গেল। সে নিজেও নিয়ে গেল কি দারুণ অতৃপ্তি!

টেলিগ্রাম পাওয়ার পরই অবশ্য আমি কলকাতায় ছুটে যাই নি। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল সুকোমল। আমি জানতাম, সুকোমলই ঊর্মিকে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় নিয়ে আসবে। এই সময়ে আমার যাবার দরকার নেই। এখন কেউই ঊর্মিকে সান্ত্বনা দিতে পারবে না। আমিও না।

আমি একমাস অপেক্ষা করলাম বম্বেতে। সেই একমাস যে কত দীর্ঘ, কত যন্ত্রণাময় তা আমি কারুকে বোঝাতে পারবো না। প্রতি মুহূর্তে আমি চাইছিলাম ঊর্মির কাছে ছুটে যেতে, অথচ জানতাম তখন যাওয়া চলে না।

এই একমাস সময় আমি নিলাম ঊর্মির শোক খানিকটা শান্ত হওয়ার জন্য। সময়ের একটা আমার অমোঘ আছেই। তা ছাড়া, এই শোকের মধ্যে আমার কথা ঊর্মির দু'একবার মনে পড়বেই। খবর পেয়েই আমি ঊর্মির কাছে ছুটে যাবো, এইটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আমি না যাওয়ায় ঊর্মি নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হবে। কারণটা বোঝার চেষ্টা করবে।

অর্থাৎ ঊর্মির মনে আমার জন্য একটা প্রতীক্ষা জন্মাবার সময় নিচ্ছিলাম আমি।

আমি যখন কলকাতায় ফিরে ঊর্মির খাটের পাশে দাঁড়ালাম ঊর্মি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো তুমি এত দেরি করে এলে?

আমি বললাম, কিছুই তো দেরি হয় নি। সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে।

ঊর্মি আমার দিকে স্থির চোখ মেলে বললো, আমার আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। আমি বাঁচবো কি জন্য?

—আমার জন্য।

—বিভাস, আমি তোমার নখেরও যোগ্য নই। আমি তোমাকে যা অপমান করেছি।

—ঊর্মি ও কথা থাক্।

—আচ্ছা একটা কথা বলো তো? রজতের সঙ্গে কি আমার সত্যিই দেখা হয়েছিল? আমি কি সত্যিই ওকে বিয়ে করেছিলাম? নাকি পুরো ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্ন?

—অনেকটা স্বপ্নেরই মতন।

—আমি রজতের মুখটাই এখন আর মনে করতে পারছি না। রজত মরে গেছে, না আমি মরে গেছি? আমিই মরে গেছি বোধহয়।

আমি ঊর্মির মাথার কাছে বসে ওর হাতটা তুলে নিলাম। মনে হলো যেন সেই হাতে একটু প্রাণের স্পন্দন নেই। ওর ঠোঁট দুটো সম্পূর্ণ বিবর্ণ। চোখ দুটোতে জ্যোতির চিহ্নমাত্র নেই।

ঊর্মির মা এবং সুকোমল বললো, ঊর্মি যদি দিনের পর দিন এই রকম ভাবে শুয়ে থাকে, তা হলে ও আর কিছুতেই বাঁচবে না। এই ভাবে মেয়েটাকে চোখের সামনে মরতে দেখা যায়?

তখন ঊর্মিকে বাঁচাবার যা একটি উপায়, আমি তাই করলাম। একদিন ওকে প্রায় জোর করেই বিছানা থেকে তুলে এনে আমার গাড়িতে এনে বসালাম। তারপর নিয়ে এলাম গঙ্গার ধারে।

একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে গঙ্গার ধারটা সেদিন অনেক নির্জন। জলের পাশে দাঁড়িয়ে আমি ঊর্মিকে বললাম, রজতের সঙ্গে দেখা হবার আগে আমরা এইখানে দাঁড়িয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?

ঊর্মি ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

—আমাদের জীবন আবার সেখান থেকে শুরু করা যায় না?

—না।

—কেন?

আমি তোমার অযোগ্য। আমি তোমাকে অপমান করেছি। আমি নষ্ট। অন্যের উচ্ছিষ্ট।

—তুমি আমার কাছে সেই ঊর্মি'ই আছো, ঠিক আগেকার মতন।

—তা হয় না। তা হয় না। তা হয় না।

—রজতকে তুমি ভুলতে পারবে না?

—ভোলা কি সস্তা?

—সম্পূর্ণ ভুলতে বলছি না! তার স্মৃতি থাকবেই, তবু সেই জন্য তুমি তো তোমার নিজের জীবনটা নষ্ট করতে পারো না।

—আমি কি আবার বাঁচতে পারবো?

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মি ঝুপ করে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি ওকে ধরে তুললাম। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হলো ঊর্মি? কি হয়েছে তোমার?

কয়েকটা বড় বড় নিঃশ্বাস নিয়ে ঊর্মি ম্লান গলায় বললো, কি জানি বোধহয় মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। কিংবা, কেউ কি আমাকে ধাক্কা দিয়েছে?

আশে পাশে কোনো লোক নেই, কে আবার ধাক্কা দেবে। এতদিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে ওর পা দুটোই দুর্বল হয়ে গেছে। ওকে দাঁড় করিয়ে রাখাই বোধহয় ভুল হয়েছে আমার।

আস্তে আস্তে ধরে ধরে ওকে নিয়ে এসে একটা বেঞ্চে বসালাম। তারপর বললাম, ঊর্মি, তুমি আমার ছিলে, এখনো আমারই আছো। মাঝখানে যেটা ঘটে গেছে, সেটা কিছুই নয়।

ঊর্মির গালে যেন রক্তের আভা দেখা দিল। ফিস ফিস করে বললো বিভাসদা তুমি মহৎ কিন্তু আমার জন্য আর কত কষ্ট সহ্য করবে?

আমি হেসে বললাম, আমি মহৎ টহৎ কিছু না। আমি স্বার্থপর। আমি তোমাকে চাই! তোমাকে ছাড়া আমার চলবেই না।

রজতের মৃত্যুর ঠিক আড়াই মাস পরে ঊর্মির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। রেজেস্ট্রী করেই। এত তাড়াতাড়ি একটি বিধবা মেয়ের আবার বিয়ে হওয়া হয়তো দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে—কিন্তু এ নিয়ে কেউ একটাও কথা বলে নি। সকলেই বুঝেছিল, ঊর্মির আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে আনার জন্য এইটাই একমাত্র উপায়।

শেষ পর্যন্ত বিয়েতে রাজী হওয়ার আগে ঊর্মি আমাকে দিয়ে এই শপথ করিয়ে নিয়েছিল যে আমি কোনদিনই রজতের নাম আর উচ্চারণ করতে পারবো না। রজত আর কোথাও নেই, সে মুছে গেল।

আমার বড়মামার একটা বাড়ি আছে মধুপুরে। বাড়িটা খালিই পড়ে থাকে, পুজোর সময় শুধু মামারা যান। আমি ঊর্মিকে নিয়ে রওয়ানা দিলাম মধুপুরে, বিয়ের দু'দিন পরেই।

কাশ্মীরে যাবার কথা বলেছিলাম, কিন্তু ঊর্মি রাজি হয় নি। ও এখন বেশী লোকজনের মধ্যে যেতে চায় না। অন্য লোকেদের সঙ্গে কথা বলতেও ওর ইচ্ছে করে না। শুধু আমার সঙ্গে নির্জন কোথাও থাকতে চায়।

সেদিক থেকে মধুপুরের বাড়িটা চমৎকার। স্টেশন থেকে বেশ খানিকটা দূরে দোতলা ছিমছাম বাড়ি, সামনে বিরাট বাগান। বাগানের গেটের সামনে দিয়েই একটা চওড়া রাস্তা চলে গেছে জসিডির দিকে। আশে পাশে আরো তিন চার খানা বড় বড় বাড়ি থাকলেও অধিকাংশই ফাঁকা। আমাদের বাড়ির ঠিক পেছন-টাতেই প্রকাণ্ড মাঠ, তারপর পাহাড়। জানালা দিয়ে তাকালেই দিগন্তের পাহাড় চোখে পড়ে।

বাড়ির মালি এবং তার বউ ছেলে মেয়ে থাকে বাগানের এক-পাশের ঘরে। ওরাই আমাদের রান্না-বান্না করে দেবে। মামা বলে দিয়েছেন, মালির বৌ নাকি দারুণ রান্না করে।

আমরা এসে পৌঁছোলাম সন্ধ্যের দিকে। বাগানের গেটের

কাছে টাঙ্গা থেকে নামার পর অনেকদিন পরে ঊর্মির মুখে একটু হাসি ফুটলো। ও বরাবরই বেড়াতে ভালোবাসে। শহর ছাড়িয়ে অন্য কোথাও গেলেই খুশী হয়।

বাড়িটা দেখে ঊর্মি বললো, বাঃ কি সুন্দর! বাড়িটা ঠিক ছবির মতন।

—তোমার পছন্দ হয়েছে তা হলে?

—এখানে আমরা অনেকদিন থাকবো?

—তোমার যতদিন খুশী। অফিসে আমার অনেক ছুটি পাওনা আছে। এইখানে আমাদের নতুন জীবন শুরু হবে।

যেন সত্যিই নতুন জীবনে প্রবেশ করছি এইভাবে আমরা দু'জনে একসঙ্গে পা ফেলে ঢুকলাম বাড়ির মধ্যে।

আমি আগে দু'তিনবার এসেছি এ বাড়িতে, সুতরাং আমার সবই চেনা। ঊর্মি প্রথমে ঘুরে ঘুরে দেখলো সারা বাড়িটা। তারপর মালিকে বাজার করতে পাঠিয়ে আমরা বেড়াতে গেলাম বাগানে।

বাগানের মাঝখানে এক সময় কেয়ারি করা গোলাপের ক্ষেত ছিল, আমি ছেলেবেলায় এসে দেখেছি, এখন আর সে-সব নেই। সারা বছর কেউ থাকে না বলেই এখন সেখানে আলু আর টম্যাটোর চাষ হয়। মালিই সেগুলো বিক্রি করে খায়। তবে, দেয়ালের পাশে পাশে অনেকগুলো বড় বড় ইউক্যালিপট্যাস গাছ আছে। এক কোণে একটা পেয়ারা বাগানও এখনো রয়ে গেছে—ছেলেবেলা আমরা ভাইবোনরা এসে এখানে খুব হুটোপুটি করতাম।

ঊর্মিকে সেই সব গল্প শোনাই, ও বেশ আগ্রহ বোধ করে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে অনেক কথা। ঊর্মিকে এখন অনেক স্বাভাবিক দেখায়।

এই আড়াই মাসে বেশ রোগা হয়ে গেছে ঊর্মি। চোখ-মুখের দুর্বল ভাবটা এখনো কাটে নি। তবু এই পড়ন্ত বিকেলে তাকে খুবই সুন্দর দেখায়। ঊর্মির দিকে তাকিয়ে আমার মধ্যে অদ্ভুত বিস্ময় জাগে। কতদিন ধরে চিনি ওকে। কতবার এই রকম

বিকেলবেলা একসঙ্গে বেড়িয়েছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সব কিছুই আলাদা। ঊর্মি আমার স্ত্রী, এতেই অনেক কিছু তফাত হয়ে যায়।

আমি আলতো ভাবে ঊর্মির হাতটা ধরলাম। বাগানটা সম্পূর্ণ নির্জন, আমাদের কেউ দেখছে না, এখন অনায়াসেই ঊর্মিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে আদর করতে পারি, দু'এক বছর আগেও এরকম করেছি, কিন্তু এখন সে কথা মনে এলো না।

ঊর্মি দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা, ঐ পাহাড়-গুলো কত দূরে?

আমি বললাম, ঠিক জানি না, বোধহয়—

—নিশ্চয় কুড়ি-পঁচিশ মাইল হবে।

—না, না, অত দূরে নয়। বড়জোর সাত আট মাইল।

—তবে যে শুনেছিলাম, যে পাহাড়কে দেখে খুব কাছে মনে হয়, আসলে সেগুলো অনেক দূরে?

—তা বলে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরের জিনিস কি আর খালি চোখে দেখা যায়?

—বিভাসদা, আমরা একদিন ঐ পাহাড়ে বেড়াতে যাবো।

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। ঊর্মি অবাক হয়ে তাকালো আমার দিকে। আমার হাসির কারণটা ঠিক বুঝতে পারলো না। একটু যেন আহত ভাবে বললো, হাসলে কেন? আমরা যাবো না ঐ পাহাড়ে?

আমি ওর হাতে চাপ দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু স্বামীকে কি কেউ দাদা বলে ডাকে?

ঊর্মি লজ্জা পেয়ে গেল! এখনো ওর পুরোনো অভ্যেসটা যায় নি। মাঝে মাঝেই বিভাসদা বলে ফেলে আমাকে! এটা এমন কিছুই না। আমি ঊর্মিকে লজ্জা দেবার জন্যই মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম।

অন্ধকার হয়ে এসেছে, আর বাগানে থাকার মধ্যে কোনো মানে হয় না। আমরা বাড়িতে ফিরে এলাম! ট্রেন-জার্নির পর ঊর্মি নিশ্চয়ই এখন ক্লান্ত, তার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আমি এক

রকম জোর করেই ঊর্মিকে বিশ্রাম নিতে পাঠালাম।

তারপর আমি একটা বই খুলে বসলাম। আমার মামারা অনেক খরচ করে এ বাড়িতে ইলেকট্রিক এনে ছিলেন বটে, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ভোল্টেজ এত ড্রপ করে যে লালচে আলোয় ভালো করে প্রায় দেখা যায় না। তা ছাড়া লোড-শেডিং হয় রাত্তিরের দিকে।

আমি অবশ্য বই খুলেও সেই দিকে মন বসাতে পারছিলাম না। মন চলে যাচ্ছে অন্য দিকে। আমার মনে এখন শুধু একটাই চিন্তা। ঊর্মিকে সুখী করতে হবে। ঊর্মির জীবনটা আবার সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলতে হবে। আমি কি তা পারবো না?

খানিকটা বাদে মালি এসে জানালো যে রান্না তৈরী হয়ে গেছে। খাবার ঠাণ্ডা করে লাভ নেই। ঊর্মি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি তাকে ডেকে নিয়ে এলাম ডাইনিং রুমে।

মালিটি সত্যিই খুব কুশলী। ডাইনিং টেবিলে পরিষ্কার চাদর পেতে প্লেট ও কাঁটা-চামচ সাজিয়ে রেখেছে। এই অল্প সময়ে রান্নাও করেছে অপূর্ব। গরম গরম ভাত, মুগের ডাল, বেগুনপোড়া ও পেঁয়াজ মাখা, ফুলকপির তরকারি ও মুর্গীর ঝোল।

আমি বেশ তরিবৎ করে খাচ্ছিলাম। একসময় ঊর্মিকে জিজ্ঞেস করলাম, রান্না কেমন হয়েছে, তোমার ভালো লাগছে?

ঊর্মি মুর্গীর ঝোলের স্বাদ নিয়ে বললো, হ্যাঁ বেশ ভালোই।

তারপর মালির দিকে তাকিয়ে বললো, ঝাল এত কম দিয়েছো কেন? দাদাবাবু ঝাল খান। কাল থেকে একটু বেশী ঝাল দেবে।

আমি খাওয়া থামিয়ে ঊর্মির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের সাতপুরুষে কেউ কখনো ঝাল খায় না। বাড়িতে লঙ্কা সম্পর্কে একটা আতঙ্ক আছে। আমি ঝাল জিনিস জিভে ছোঁয়াতে পারি না। একবার দক্ষিণ ভারতে অফিসের কাজে গিয়ে আমি ঝাল রান্নার জ্বালায় এমনই অস্থির হয়ে উঠেছিলাম যে, কয়েকদিন শুধু ফল আর দই খেয়ে কাটিয়েছি।

আমার খাদ্য-অভ্যেস যে ঊর্মি একেবারেই জানে না তা নয়।

ওদের বাড়ি অনেকবার নেমন্তন্ন খেয়েছি। তা ছাড়া দিল্লীতে ঊর্মির দাদার বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন ছিলাম। তখন আমার জন্য বিশেষ করে ঝাল ছাড়া রান্না হতো।

ঊর্মি নিশ্চয়ই সে কথা ভুলে গেছে। এতবড় একটা ঝড় বয়ে গেল ওর জীবনের ওপর দিয়ে। এসব খুঁটিনাটি কি করে মনে থাকবে। এমন হতে পারে, ঊর্মি নিজেই ঝাল খেতে ভালোবাসে, তাই ধরেই নিয়েছে যে আমিও। ঠিক আছে, এখন থেকে আমিও ঝাল খাওয়া অভ্যেস করবো।

মালিকে বললাম, হ্যাঁ, কাল থেকে রান্নায় একটু ঝাল দিও। ঝাল ছাড়া খাওয়া যায় না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা একটুক্ষণ বসলাম দোতলার বারান্দায়। বাগানের সামনে দিয়ে রাস্তাটা বহুদূরে চলে গেছে, ফিকে জ্যোৎস্নায় সেটাকে অন্তহীন পথ মনে হয়। হাওয়ায় ইউক্যালিপটাসের পাতার ঝিরঝিরে শব্দ, একটা টাটকা সুগন্ধও পাওয়া যায়। আমরা কথা না বলে চুপ করে বসে দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলাম।

রাত মাত্র ন'টা। চতুর্দিক নির্জন বলে এরই মধ্যে গভীর রাত মনে হয়। আমার দেরি করে ঘুমোনো অভ্যেস। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ বই না পড়লে আমার ঘুম আসে না। এখন থেকে এই সব অভ্যেসও পাল্টাতে হবে।

আমার মনে হলো, ঊর্মি আজ ক্লান্ত, ওকে আর বেশীক্ষণ জাগিয়ে রাখা ঠিক নয়। হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঊর্মি তোমার শীত করছে?

—একটু।

—চলো উঠে পড়ি। শুয়ে পড়া যাক্।

—তুমি এক্ষুণি শোবে?

—হ্যাঁ, আমার একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে।

ঊর্মি আর আপত্তি করলো না। আমরা বারান্দা ছেড়ে ঘরে

চলে এলাম। ঊর্মি চুল বেঁধে, মুখে ক্রিম মেখে শুয়ে পড়লো, আমিও জামাকাপড় বদলে বিছানায় চলে এলাম।

জানালা দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরে। অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। কোথা থেকে যেন একটা ফুলের হাল্কা গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়।

বিয়ের পর অন্যদের যেমন ফুলশয্যা হয়, আমাদের সেরকম কিছু হয়নি। রেজিস্ট্রী বিয়ের পর আমরা আলাদা ভাবে দু'জনে দু'জনের বাড়িতেই থেকেছি। প্রকৃতপক্ষে আজই প্রথম সেই ফুলশয্যার রাত।

আমার কি উচিত ছিল কিছু ফুল কিনে এনে বিছানায় ছড়িয়ে দেওয়া? একবার কথাটা মনে এসেছিল অবশ্য। তারপর লজ্জা পেয়েছিলাম। নিজে নিজে এসব করা যায় না।

আজই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের দিন। ঊর্মির শরীরের মাদকতার জন্য আমার মধ্যে একটা তীব্র ব্যাকুলতা থাকলেও আমি মনে মনে ঠিকই করে রেখেছিলাম যে এ ব্যাপারে আমি তাড়াহুড়ো করবো না। ঊর্মির মন এখনো দুর্বল, হঠাৎ কি প্রতিক্রিয়া হবে কে জানে। বরং আরও কিছুদিন সময় কাটুক। ঊর্মি যখন নিজে থেকেই চাইবে—

আমি ঊর্মির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ঊর্মি নিঃশব্দে শুয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর এক সময় মনে হলো ও ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কাঠ হয়ে জেগে রইলাম। শরীরের মধ্যে একটা ছটফটানি, আমাকে দমন করতেই হবে, কিন্তু বোধহয় সারারাত ঘুম আসবে না।

এক সময় ঊর্মি পাশ ফিরে আমার কাছাকাছি চলে এসে মৃদু গলায় বললো, তোমার বুকে আমি একটু মাথা রাখবো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, রাখো না! তুমি ঘুমোও নি?

—ঘুম আসছে না।

—আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

—তুমি আমাকে ঘেন্না করবে না তো?

—ছিঃ, এ কি কথা বলছো?

আমি আলতো ভাবে ঊর্মির মুখটা তুলে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। আর বেশী কিছু এখন না।

ঊর্মি আমাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজলো। আমি ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি, তুমি জানো না?

—জানি তুমি আমাকে আর দূরে চলে যেতে দিও না।

—ঘুমোও, এবার ঘুমোও।

—তুমিও ঘুমোও। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমাকে ছেড়ো না।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। আমার বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ ঊর্মি ধড়ফড় করে উঠে বসে বললো, ওকি? ওকি?

আমি চমকে উঠেছিলাম, উঠে বসে ঊর্মিকে ধরে বললাম, কি, কি হয়েছে?

ঊর্মি বিহ্বলভাবে বললো, কিসের শব্দ? কে আসছে?

—কোথায় শব্দ? কোনো শব্দ নেই!

—শুনতে পাচ্ছো না? ভাল করে শোন—

আমি উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বহুদূরে একটা ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে ঠিকই। রাস্তার কোন গাড়ির আওয়াজ।

আমি বললাম, রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। তাতে কি হয়েছে?

—না, তুমি ভালো করে শোন!

এবার বোঝা যায় আওয়াজটা একটা মোটর সাইকেলের। ক্রমেই আওয়াজটা বাড়ছে, অর্থাৎ এদিকেই আসছে।

ঊর্মি চেঁচিয়ে উঠলো, ও আসছে। ও আমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে।

আমি ঊর্মিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, ঊর্মি, কি ছেলেমানুষী করছো। রাস্তা দিয়ে একটা মোটর সাইকেল যাচ্ছে, তাতে তোমার

ভয় পাবার কি আছে?

—না, না, না, তুমি জানো না, ও আসছে। ও আমাকে ছাড়বে না।

মোটর সাইকেলের আওয়াজটা খুবই কাছে এসে পড়েছে। আমি ঊর্মিকে চেপে ধরে রইলাম। ঊর্মির দুর্বল মনে নানারকম ভয়ের চিন্তা। মোটরসাইকেলটা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে পেরিয়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

কিন্তু শব্দটা আমাদের বাড়ির খুব কাছাকাছি এসে হঠাৎ থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঊর্মি তীব্র কান্নার সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, ও এসে পড়েছে। ও ঠিক এসে পড়েছে। আমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে!

আমি ঊর্মিকে ছেড়ে লাফিয়ে চলে এলাম জানলার কাছে। রাস্তায় কেউ নেই। মোটর সাইকেলটা দেখা যাচ্ছে না। পাতলা জোৎস্না ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। নিশ্চয়ই মোটর সাইকেলটা ঢুকে গেছে কাছাকাছি কোন বাড়িতে। আমাদের তিনখানা বাড়ি আছে। 'সেন লজ'-এ মানুষজন আছে দেখেছিলাম। সে বাড়ির কারুর মোটরসাইকেল থাকা খুবই সম্ভব।

জানলা থেকে আবার ঊর্মির কাছে ফিরে আসতেই ঊর্মি কান্নায় ভেঙে পড়ে বলতে লাগল, ও আমাকে কেড়ে নিতে এসেছে। তুমি ছেড়ে দিও না, ছেড়ে দিও না। বিভাসদা, তুমি আর কিছুতেই আমাকে ছেড়ে দিও না—।

॥ ৯ ॥

বোম্বাইতে যে ঘুমের ওষুধগুলো কিনেছিলাম, তার কিছু অবশিষ্ট ছিল। ভেবেছিলাম ওগুলো আর কখনো কাজে লাগবে না। কিন্তু আবার কাজে লাগলো। ঊর্মিকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েই ঘুম পাড়াতে হলো। আমি প্রায় সারারাতই জেগে রইলাম। সে রাত আর কিছু হলো না।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঊর্মি কিন্তু রাত্তিরের কথা কিছুই উল্লেখ করলো না। মুখখানা একটু গম্ভীর ও ম্লান।

আমি বললাম, ঊর্মি চট করে তৈরী হয়ে নাও। আমরা একটু বেরুবো। সকালবেলা এখানে বেড়াতে খুব ফাইন লাগে।

কোনোরকম ওজর আপত্তি তোলার সুযোগ না দিয়েই আমি ঊর্মিকে হাত ধরে তুললাম বিছানা থেকে। ঊর্মি অল্পক্ষণেই তৈরী হয়ে নিল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম!

সকালবেলা বেড়াতে সত্যিই ভালো লাগে। বাতাসে একটা শিরশিরে ভাব। ঘাসগুলো ভিজে আছে শিশিরে।

আমরা বাগান ছেড়ে চলে এলাম বাইরে রাস্তায়। বেশ খানিকটা দূর চলে গেলাম হাঁটতে হাঁটতে।

আমি গোপনে লক্ষ্য করেছিলাম। রাস্তায় মোটর সাইকেলের টায়ারের দাগ দেখা যায় কিনা। ঠিক বোঝা গেল না। গরুর গাড়ির চাকার দাগই প্রকট। 'সেন-লজ'-এর কম্পাউণ্ডটা বিরাট। ওর ভেতরে কোনো মোটর সাইকেল রাখা থাকলেও বাইরে থেকে দেখা যায় না। ও বাড়িতে অনেক লোক এসেছে। বারান্দায় বসে চা-খাচ্ছে পাঁচ-সাতটি যুবক-যুবতী। একটা রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজাচ্ছে।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, শিগগিরই একদিন ও বাড়িতে গিয়ে ওদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। মানুষ নির্জনতা খুঁজতে আসে ঠিকই। কিন্তু আবার মানুষের সঙ্গ ছাড়া ভালোও লাগে না।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমরা চলে এলাম শোওয়ার ঘরে। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয় নি বলে আবার একটা দিবা-নিদ্রা দেবার সাধ ছিল।

কিন্তু ঊর্মি হঠাৎ বললো, কাল রাত্তিরে আমি তোমাকে খুব জ্বালাতন করেছি, তাই না?

আমি অবাক হবার ভাব করে বললাম, জ্বালাতন? আমাকে আবার তুমি কখন জ্বালাতন করলে? একটু জ্বালাতন করলে তো

আমি খুশীই হতাম।

—কাল আমি মিছামিছি ভয় পেয়েছিলাম।

—মন দুর্বল থাকলে ওরকম হয়।

—মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করো।

ঊর্মি নিজেই এসে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমার গালে গাল ঠেকিয়ে বললো, তুমি এত ভালো! তবু আমি তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম কি করে?

আমি অনুভব করলাম, ঊর্মির গাল রীতিমত উত্তপ্ত। কামনা-বাসনা যে উত্তাপ আনে। ঠিক আগেকার ঊর্মির মতন।

গভীর আবেগে আমি ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম। ঊর্মি ওর জিভ দিয়ে সাড়া দিল। এবার সব বাঁধ ভেঙে গেল। আমি চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিলাম ঊর্মিকে। ওর কানের পাশে, ঘাড়ে, গলায়, বুকে আঁকা হলো অজস্র চুম্বন। এক সময় আমরা বিছানায় গড়িয়ে পড়লাম।

আমার বহুদিনের অতৃপ্ত বাসনা মুক্তি পেল। প্রায় এক ঘণ্টা উন্মত্ততার পর আমরা দুজনে গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হলাম।

বিকেলবেলা সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। শারীরিকভাবে কাছাকাছি না এলে নারী-পুরুষ কখনো সত্যিকারের কাছাকাছি আসতে পারে না। ঊর্মির মধ্যে যেটুকু আড়ষ্টতা ছিল তা সম্পূর্ণ কেটে গেছে। এখন সে বার বার আমার দিকে লাজুক লাজুক ভাবে তাকাচ্ছে। ঠিক নববধূর মতনই লজ্জারুণ তার মুখ।

সন্ধেবেলা চা খেতে খেতে আমরা পরিকল্পনা করতে লাগলাম, কোথায় কবে বেড়াতে যাওয়া হবে। এখান থেকে গিরিডি, শিমুলতলা, দেওঘর প্রভৃতি অনেক জায়গাতেই যাওয়া যায়। একটা গাড়ি সঙ্গে থাকলে ভালো হতো। যাক, তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। জসিডিতে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে, আমি জানি।

একটুবাদে ঊর্মি বললো, তুমি একটা গান শোনাও না।

অনেকদিন তোমার গান শুনি নি।

আমি বললাম, আমি আর কি গান শোনাবো। ইস্, তোমার সেতারটা আনলে পারতে! মাঝে মাঝে সেতার বাজালে তোমার মন ভালো থাকতো।

—আমার মন এখন বেশ আছে। তুমি একটা গান গাও।

আমি মাথা নীচু করে গান ভাবতে লাগলাম। এক সময় গানের চর্চা করতাম ঠিকই। দক্ষিণীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোর্সও শেষ করেছিলাম। চাকরিতে ঢোকার পর আর সময় পাই না বিশেষ।

খানিকক্ষণ গুণ গুণ করে একটা গান ধরলাম:

দেখা না দেখায় মেশা হে
হে বিদ্যুৎলতা···

সবে মাত্র দু'লাইন গেয়েছি, ঊর্মি বাধা দিয়ে বলে উঠলো, না, না, এ গান নয়! এ গান নয়!

আমি চমকে উঠলাম। কিছুই বুঝতে পারলাম না। ঊর্মির মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেছে আবার।

—কি হয়েছে ঊর্মি?

—তুমি এই গানটা গাইলে কেন?

তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল। রজতের সঙ্গে যেদিন প্রথম ঊর্মির আলাপ হয়েছিল, সেদিন নৌকোর ওপর রজত এই গানটা গেয়েছিল। ও খুব মোটা গলায় চেঁচিয়ে গান করতো। এখনো যেন শুনতে পাচ্ছি। রজতের সেই গান শুনে ঊর্মি বিচলিত হয়ে পড়েছে।

আমি কিন্তু কোনো রকম চিন্তা করে এ গানটা গাই নি। আপনিই গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আগে মনে পড়লে নিশ্চয়ই এটা গাইতাম না। আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা গান ধরার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আর যেন জমলো না। ঊর্মি মাথা নীচু করে বসে আছে।

মালী এসে বললো, নীচে কে একজন আমাকে ডাকছে।

উর্মিকে একা রেখে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই, তাই ওকে বললাম, চলো, তুমিও নীচে চলো।

—অচেনা লোকের কাছে গিয়ে আমি কি করবো?

—একটু কথা বললেই অচেনা লোক চেনা হয়ে যাবে।

—না, ইচ্ছে করছে না। আমি এখানেই বসছি, তুমি ঘুরে এসো।

—আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি।

নীচে এসে দেখলাম একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার বৃদ্ধ বসে আছেন। আলাপ-পরিচয়ের পর শুনলাম ইনি আমার বড়মামার বন্ধু। চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর মধুপুরেই পোলট্রির ব্যবসা করেছেন। এ বাড়িতে লোক এসেছে শুনে খবর নিতে এসেছেন বড়মামার।

ভদ্রলোক স্থানীয় সমস্যা, রাজনীতি, মুরগীর ব্যবসায়ের সুবিধে-অসুবিধে ইত্যাদি অনেক বিষয় তুললেন। বোধহয় কথা বলার লোক পান না। এ সব কথা শুনতে আমার ভাল লাগছিল না। তবু ভদ্রতা বজায় রাখবার জন্য হুঁ হাঁ করে যেতেই হয়।

একটু বাদে প্রায় একরকম জোর করেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওপরে চলে এলাম। বারান্দায় যেখানে আমরা বসেছিলাম, সেখানে উঁকি দিয়ে দেখলাম উর্মি নেই। ঘরের মধ্যে চলে গেছে নিশ্চয়ই।

ঘরের মধ্যে এসেও উর্মিকে দেখতে পেলাম না। আমার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠলো। উর্মি কোথায় গেল? দোতলার অন্য ঘরগুলো তালাবন্ধ। আমাদের দরকার লাগবে না বলে খোলা হয় নি। বাথরুমের দরজাটাও খোলা, তবু ভেতরটা দেখে এলাম।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, উর্মি, উর্মি।

কোন সাড়া নেই।

উর্মি কোথায় যেতে পারে? নীচে নেমে গেলে বসবার ঘর দিয়েই একমাত্র যাওয়া যায়। তা হলে আমি দেখতে পেতাম ঠিকই।

তবু আমি দৌড়ে এলাম নীচে। সম্ভাব্য জায়গাগুলো দ্রুত দেখে নিলাম। উর্মি কোথাও নেই।

রান্নাঘরে যায় নি তো? সেখানে যাওয়ার কোনো কথা নয়, তবু দেখে এলাম একবার। মালীকে কিন্তু বললাম না, সে বেচারা অকারণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে।

বাগানটাও একবার ঘুরে দেখবো সবটা ভাবলাম। তারপরই মনে হলো, উর্মি নীচে নেমে আসতে পারেই না। আমি বসবার ঘরে এতক্ষণ ছিলাম, ও কি করে সেখান দিয়ে বাইরে যাবে? তাছাড়া আমাকে না বলে যাবেই বা কেন?

আবার ছুটতে ছুটতে উঠে এলাম দোতলায়। বারান্দা, ঘর, বাথরুম তন্ন তন্ন করে দেখলাম। উর্মি নেই।

উর্মি নেই? এ কি করে সম্ভব হতে পারে?

আমি গলা ফাটিয়ে ডাকলাম, উর্মি! উর্মি!

মনে হলো আমার চিৎকার ফাঁকা বাড়িতে প্রতিধ্বনি হচ্ছে। আরও দু'তিন বার ডাকার পর একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেলাম। কোথা থেকে শব্দটা আসছে? হ্যাঁ, উর্মির গলা, কিন্তু সে কোথায়?

আওয়াজটা দূর থেকে আসছিল, একটু কান পাততেই বুঝতে পারলাম, সেটা আসছে ছাদ থেকে। উঃ, কি বোকা আমি! ছাদের কথাটা আমার মনে পড়ে নি!

ছাদের সিঁড়ির দিকে দৌড়োতেই শুনতে পেলাম উর্মি কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও।

আমি প্রচণ্ড চিৎকার করে বললাম, উর্মি, আমি আসছি, তোমার কোনো ভয় নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনতে পেলাম, অনেক দূরে সম্ভবত ছাদের এক শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে উর্মি বলছে না, না, আমি যাবো না, আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও—

ছাদের দরজাটা চেপে বন্ধ করা ছিল। লাথি মেরে সেটাকে খুলে আমি দৌড়ে গেলাম। ছাদের এক কোণে কার্নিসের ওপর মাথা দিয়ে বিপজ্জনক ভাবে ঝুঁকে উর্মি দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি ওকে স্পর্শ করতেই ও ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে অসম্ভব

জোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, ও আমাকে নিয়ে যাচ্ছিলো। ও আমাকে নিতে এসেছে। ও আমাকে ছাড়বে না! আমি যাবো না। আমি তোমাকে ছেড়ে যাবো না, আর কিছুতেই যাবো না।

আমার গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে এলো। ঝিম ঝিম করতে লাগলো মাথাটা। ঊর্মি কি তাহলে পাগল হয়ে যাচ্ছে! এ তো পাগলামিরই লক্ষণ। ঊর্মি সাহসী মেয়ে, সে কোনো দিন ভূত টুত বিশ্বাস করে না—তা হলে এ রকম ব্যবহারের মানে কি?

ওর মাথাটা বুকে চেপে ধরে বললাম, ঊর্মি, শান্ত হও! শান্ত হও! এ কি করছো?

ফোঁপানিতে ঊর্মির শরীরটা কাঁপছে। সেই অবস্থাতেই বললো, ও এসেছিল। ও আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল!

—কে এসেছিল?

—রজত! আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি।

—কি যা-তা কথা বলছো! চেয়ে দ্যাখো, এখানে কেউ নেই। তা ছাড়া সে এখানে কি করে আসবে?

—তুমি বিশ্বাস করছো না? সে আমাকে জোর করে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এসেছিল।

—ঊর্মি, নীচে চলো।

—ও আমাকে জোর করে চেপে ধরে আমার ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরেছিল। যে-রকম ওর স্বভাব। এই দ্যাখো, আমার ঘাড়ের কাছে লাল দাগ হয়ে গেছে। দ্যাখো, তুমি দ্যাখো—

আজ জ্যোৎস্না অনেক উজ্জ্বল। অনেক কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়। তবে, ঊর্মির ঘাড়ের কাছে লাল দাগ হয়েছে কিনা সেটা তো ওর দেখতে পাওয়ার কথা নয়। আমি দেখতে পারি। লালচে দাগ একটা আছে ঠিকই। কিন্তু সেটা দুপুরবেলা আমিই করে দিয়েছিলাম। তখনই লক্ষ্য করেছি।

আমি বললাম, দাগ টাগ কিছু নেই। এরকম ভাবে আর

রাত্তিরে একা একা ওপরে এসো না।

—আমি নিজে ইচ্ছে করে আসি নি। তুমি ওকে তাড়িয়ে দিতে পারো!

—হ্যাঁ পারবে। চলো, নীচে চলো লক্ষ্মীটি!

ঊর্মি যেন একটা যন্ত্র-মানুষ, এই ভাবে আমি ওর কোমর ধরে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এলাম। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে খিল তুলে দিলাম।

সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা মাত্র নেমেছি, এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটল। এ রকম ঘটনাকে কাকতালীয় বলা যায়। মানুষের জীবনে এমন ঘটনা ঘটেই। ঠান্ডা মাথায় বিচার করলে এর একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। কিন্তু বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আর ব্যাখ্যা খোঁজার দিকে মন থাকে না।

হঠাৎ একটা গান ভেসে উঠলো, সেই গান, দেখা না দেখায় মেশা হে, হে বিদ্যুৎলতা—গানটা যেন ছাদ থেকেই বাজছে।

ঊর্মির দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল আমার বুকে, গানটা শুনেই সে স্প্রিংয়ের মতন সোজা হয়ে গেল। অদ্ভুত পাগলাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, ঐ যে, ঐ যে। শুনতে পাচ্ছো না? ও এখনো আছে? গান গাইছে!

মনঃস্থির করতে আমার খানিকটা সময় লেগেছিল। তারপরই ঝট করে আবার দরজাটা হাট করে খুলে দিলাম। মনে হলো যেন, গানটা ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যাচ্ছে। হাওয়ায় ভাসছে গান। চট করে আবার থেমে গেল।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেই সময় ছাদে পা দিতে আমার ভয় করেছিল। ভীষণ দুর্বল লাগছিল মাথাটা। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তারপর আমি ভাবলাম, আমিও কি ঊর্মির মতন পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি? একি ছেলেমানুষী!

ঊর্মি আমার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে টানার চেষ্টা করে ফিস ফিস

করে বললো, যেও না, তুমি যেও না! নিজের কানে এবার শুনলে তো!

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, ধ্যাৎ! এটা তো রেকর্ড! পঙ্কজ মল্লিকের রেকর্ড আছে। সেন লজ-এ রেকর্ড প্লেয়ার আছে সকালে দেখেছি, বিকালেও গান শুনতে পেয়েছি।

—না, না, ও আমাদের ছাদের ওপরে—

—রাত্তিরবেলা দূরের আওয়াজকেও কাছের মনে হয়।

আমার ইচ্ছে হলো তক্ষুনি সেন লজ-এ ছুটে গিয়ে প্রমাণ নিয়ে আসি, ওরা পঙ্কজ মল্লিকের এ রেকর্ডটা বাজাচ্ছিল কিনা। কিন্তু তা হলে উর্মিকে একা রেখে যেতে হয়। ওকে এই অবস্থায় নিয়েও যাওয়া যায় না। তাই বিরক্ত হলাম।

উর্মি সেই রাত্রে কিছুই খেলো না। অনেক জোর করলাম। কিন্তু ওর একটুও খাবার ইচ্ছে নেই। সব খাবার থালায় ফেলে রাখলো। আমরা তাড়াতাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম।

স্পষ্ট বুঝলাম, আজও সারা রাত উর্মিকে পাহারা দিতে হবে। ওর পাগলামির ভাবটা ক্রমশঃ বাড়ছে। কোথাও একটু খুটখাট শব্দ কিংবা পাখির ডাকেই ও চমকে উঠছে। মাঝে মাঝেই বলছে, ও আসবে, ও ছাড়বে না।

উর্মি আমার হাতটা সর্বক্ষণ শক্ত করে চেপে ধরে আছে। আমি ওকে অনবরত বোঝাচ্ছি, কেউ আসবে না। কেউ আসতে পারে না। তুমি যার কথা বলছো, তার পক্ষে আসা তো অসম্ভব।

উর্মি তবু বললো, তুমি জানো ও কি রকম জেদী। ও দারুণ অতৃপ্তি নিয়ে গেছে। ও ফিরে আসতে চাইবেই। ও আবার আমাকে কেড়ে নেবে।

উর্মিকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে একসময় আমিই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। আমার মাথাটা অবশ লাগছে। কিন্তু আমাকে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তো চলবে না। মাথা ঠিক রাখতেই হবে।

আজও একসময় মোটর সাইকেলের আওয়াজ শোনা গেল।

সেই সময় উর্মিকে সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। আমি ওকে সবলে জড়িয়ে ধরে বসে রইলাম।

উর্মির ঘুম আসারও লক্ষণ নেই। কিন্তু আজ আর আমি ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াতে সাহস করলাম না। যতদূর শুনেছি, এ রকম দুর্বল মানসিক অবস্থায় ঘুমের ওষুধ খাওয়া আরও বেশী ক্ষতিকর। কাল এ সম্পর্কে একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। কিংবা বোধহয় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে আলোচনা করাই বেশী দরকার। কিন্তু সেরকম কাউকে কি এখানে পাওয়া যাবে। না হলে ফিরেই যেতে হবে কলকাতায়।

উর্মি নিজেই আমার কাছে কয়েকবার ঘুমের ওষুধ চাইলো। আমি ওকে বললাম, ফুরিয়ে গেছে। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের ঘুম-পাড়াবার মতন করে ওর মাথা চাপড়ে দিতে লাগলাম।

তখন কত রাত জানি না। সমস্ত পৃথিবী নিঝুম। উর্মিও কিছুক্ষণ চুপ করে আছে। আমার একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। অনেকক্ষণ ধরে চেপে বসে আছি। উর্মিকে একা ফেলে যেতে হবে বলে যেতে পারছি না। এবার উর্মি ঘুমিয়েছে, এখন যাওয়া যায়।

ওর হাত ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। কোনো রকম শব্দ যাতে না হয় তাই পা টিপে টিপে চলে এলাম দরজার কাছে। একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছিল, বাইরে গিয়েই ধরাবো।

দরজাটা খুলতেই দেখলাম বারান্দার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রজত। পরিষ্কার জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সেখানে। রজতের লম্বা শরীরটা হেলান দিয়ে দাঁড়াবার জন্য এখন বেঁকে আছে, মাথায় বড় বড় চুল, শার্টের বোতাম খোলা।

আমাকে দেখে হাসিমুখে বললো, কি বিভাস—

আমি অস্ফুট গলায় বললাম, রজত!

রজত আবার কি যেন বলতে গেল। আমিও প্রাণপণে চিৎকার করলাম—

আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, পা থর থর করে কাঁপছে, মাথার

মধ্যেটা একেবারে ফাঁকা। আমি কিছুতেই সামলাতে পারছি না।

আমি ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

॥ ১০ ॥

এর পরের দুটো দিনের ঘটনার সঙ্গে আমার জীবনের আর কিছুই মেলে না। সেই অদ্ভুত ব্যাপারের কোনো ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না। অবশ্য ডাক্তাররা অনেক রকম কথাই বলেছেন। তার মধ্যে কোনোটা সত্যি হবে নিশ্চিত।

আমার ধারণা আমি মধ্য-রাত্রে দরজা খুলে রজতকে দেখেছিলাম। কিংবা হয়তো দেখি নি। চোখের ভুল। হ্যালুসিনেশান। সে যাই হোক, সেই মুহূর্তে যে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে দারুণ সত্যি মনে হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

আমি ঠিক অজ্ঞান হয়ে যাই নি, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। আমার ধারণা আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম, আসলে তা নয়, আমি দেয়াল ধরে পতনের হাত থেকে রক্ষা করছিলাম নিজেকে। আমার ব্যবহারটা তখন অন্ধের মতন, সত্যিই যেন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আমার চিৎকার শুনে ঊর্মি ঘুম ভেঙে উঠে এসেছিল। সে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে। ঊর্মি জিজ্ঞেস করেছিল, কি হয়েছে তোমার?

আমি ফিস ফিস করে বলেছিলাম, রজত···রজত সত্যিই এসেছে।

কোথায়, কোথায়, বলে ঊর্মি ছুটে গেল বাইরে। ওকে বাধা দেবার ক্ষমতাও আমার নেই।

একটু বাদেই ঊর্মি ফিরে এসে আমাকে ধরলো। খুব শান্ত এবং দৃঢ় গলায় বললো, না, কেউ নেই। চলো, ভেতরে চলো।

এর পর সব ব্যাপারটাই উল্টে গেল। এতক্ষণ ঊর্মিকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম আমি, এখন সে-ই আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

ঊর্মি আকস্মিকভাবে দারুণ শান্ত হয়ে গেছে। যেন ফিরে এসেছে ওর মনের জোর। আমাকে দুর্বল হতে দেখেই ও নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে।

আমাকে রীতিমতন এক ধমক দিয়ে ঊর্মি বললো, তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তুমি কখনো রজতের নাম আর উচ্চারণ করবে না!

—কিন্তু আমি যে রজতকে দেখলাম!

—মোটেই কিছু দেখো নি তুমি। মৃতেরা কখনো ফিরে আসে না। এতক্ষণ আমি পাগলামি করছিলাম। সবই আমার ভুল!

আমার ভীষণ ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল। কথা বলারও জোর পাচ্ছিলাম না। এবং আশ্চর্যের বিষয়, একটু বাদেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে চোখ মেলে দেখলাম, ঊর্মি তার আগেই জেগে গেছে। বিছানায় নেই। একটু বাদেই ও দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে এলো। আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি শুয়ে শুয়ে চা খাবে?

চায়ের কাপ নিয়ে ঊর্মি বিছানায় বসলো আমার পাশে। আমি ওর কোমর জড়িয়ে ধরে বললাম, কাল রাত্তিরে আমি চোখে ভুল দেখেছিলাম, তাই না?

—হ্যাঁ, তুমি কি রকম অদ্ভুত করছিলে। তোমার এ রকম হলো কেন? তুমি তো কখনো আজে বাজে ব্যাপারে বিশ্বাস করতে না।

—কি রকম যেন হয়ে গেল।

—আর ওরকম ভাবে আমাকে ভয় দেখিও না!

—তুমি আর ভয় পাবে না তো!

—না। আমার ওসব কেটে গেছে। কি বোকার মতনই যে ব্যবহার করছিলাম। মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি? ওঠো, মুখ টুখ ধুয়ে নাও!

ঊর্মি সুস্থ হয়ে উঠেছে, সব ব্যাপারটাই এখন শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত। এবার সত্যিই আমাদের নতুন জীবন শুরু হবার কথা। তবু আমি সারা শরীরে কিরকম যেন ছটফটানি বোধ করছি। একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। এটা কাটানো দরকার।

আমি বললাম, একটু পরে উঠবো। আমার সিগারেট দেশলাইটা এনে দাও তো একটু।

সেগুলো এনে দিয়ে ঊর্মি আবার আমার পাশে বসলো। আমি একটা সিগারেট বার করে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে ঠুকতে লাগলাম।

এক সময় লক্ষ্য করলাম ঊর্মি আমার আঙুলের দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি দেখছো ঊর্মি?

—কিছু না।

আমি আমার দু'হাতের দিকে তাকালাম। অস্বাভাবিক তো কিছু নেই।

ঊর্মি বললো, এবারে ওঠো। আজ আর বেড়াতে যাওয়া হবে না?

—বড্ড রোদ উঠে গেছে।

—গিরিডি এবং দেওঘর কবে বেড়াতে যাবো আমরা?

—গেলেই হবে। ব্যস্ততার তো কিছু নেই। তুমি তো এখানে অনেক দিন থাকবে বলছো।

—যতদিন তোমার ছুটি না ফুরোয়।

সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়েছিল, জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম টুকরোটা। ঊর্মি আবার সেই রকম ভাবে তাকালো।

আগে আমি কিছু বুঝি নি। সেদিন তিন চার বার সিগারেট ধরাবার পর এক সময় আমার খেয়াল হলো, প্রত্যেকবারই আমি সিগারেট প্যাকেট থেকে বার করে ধরাবার আগে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ওপর ঠুকে নিচ্ছি। এবং সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এলে, কাছাকাছি অ্যাসট্রে থাকলেও আমি টুকরোটা সেখানে না

নিভিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি জানালা দিয়ে।

এ রকম স্বভাব আমার কখনো ছিল না। রজত এ রকম করতো। কখন যেন অবচেতন ভাবে আমি রজতকে অনুকরণ করতে শুরু করেছি। এর কারণ কি?

যাই হোক, এ নিয়ে বেশী মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই। ব্যাপারটাকে আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম।

আসলে ব্যাপারটা আমি ভুলেই গেলাম। এবং পরবর্তী সিগারেট ধরাবার সময় ঠিক সেই ভাবে আবার ঠুকতে লাগলাম বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখে।

কাল রাত্রে ঊর্মির পাগলামির ভাব দেখে আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ডাক্তার ডাকতে হবে। কিংবা শিগগিরই কলকাতায় ফিরতে হবে। কিন্তু আজ সকালে ঊর্মি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক।

সকালবেলাই স্নান করে নিয়েছে। স্নান করার পর ভিজে চুলে সব মেয়ের মুখেই একটা লক্ষ্মীশ্রী ফুটে ওঠে। ঊর্মির রূপ এই সময় আরও বেশী খোলে। ঊর্মির সেই উদাসীন উদাসীন ভাবটা আর নেই। সে বরং ঘুরে ঘুরে টুকিটাকি করছে এবং ঘরটাকে সাজাচ্ছে। আমরা এখানে বেশ কিছুদিন থাকবো তো, সেই জন্য। এই দু'দিন আমাদের জিনিসপত্তর যেমন ভাবে আনা হয়েছিল, প্রায় সেই রকম ভাবেই পড়ে ছিল।

এমনকি ঊর্মি ইচ্ছে প্রকাশ করলো, সে দু'একটি আইটেম নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবে আমাকে। প্রত্যেকদিন মালীর রান্না খাওয়া যায় না। মালী যদিও বেশ ভালোই রাঁধে, তবে মাছটা একেবারে পারে না। প্রত্যেকদিন মাংস খাওয়া যায় না, বাঙালী জিভে মাছ না হলে খাওয়াটাই জমে না ঠিক মতন।

ঊর্মি বললো, তুমি যাও না, বাজার থেকে ভালো দেখে মাছ নিয়ে এসো না।

আমি হাসলাম। আজ থেকে তাহলে আমাদের খাঁটি বিবাহিত

জীবন শুরু হলো। স্বামী বাজার করে আনবে। স্ত্রী থাকবে রান্নাঘরে। সারাদিন স্ত্রী ব্যস্ত থাকবে সংসারের কাজে, স্বামী বাইরে বাইরে ঘুরবে।

আমি ঊর্মিকে বললাম, তুমিও চলো না। একসঙ্গে বাজারে যাই।

ঊর্মি বললো, আমি আজ যেতে পারবো না। আমার কত কাজ! পর্দাগুলো লাগাতে হবে। আয়নাটা পরিষ্কার করতে হবে।

আমি কখনো বাজার করি নি। আমাদের নিজেদের বাড়িতে ও কাজটা চাকররাই সারে। তবু ঊর্মির অনুরোধে বেরিয়ে পড়লাম। ঊর্মি আরও কতকগুলো জিনিসের লিস্ট বানিয়ে দিল, যেমন সাবান, সূঁচ সুতো, কনডেন্সড মিল্ক, পাঁপড় ইত্যাদি।

সেন লজ-এর সামনে দু'জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। আজও ভেতরে রেকর্ড প্লেয়ারে গান বাজছে।

আমার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, ওরা কাল রাত্তিরে পঙ্কজ মল্লিকের 'দেখা না দেখায় মেশা হে' গানটা বাজিয়েছিল কিনা। কিন্তু লজ্জা করলো। হঠাৎ এরকম প্রশ্নে ওরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে।

নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করার মতন প্রতিভা আমার নেই। অচেনা লোকের কাছে আমি এখনো একটু লাজুক হয়ে পড়ি। তবু সেন লজ-এর সামনে দাঁড়ানো লোক দুটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আমিই হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আপনারা কবে এসেছেন?

ভদ্রলোক দু'জনও সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। তারপর নাম-জানাজানি এবং কলকাতার কোন্ পাড়ায় আমাদের বাড়ি এবং ওঁদের বাড়ি, এই সব কথাবার্তা হলো। ওঁরা ওঁদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে বসবার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমি পরে এক সময় যাবো বলে ওদের নিমন্ত্রণ করলাম আমাদের বাড়িতে আসার।

এই সময় রাস্তা দিয়ে একটা খালি টাঙ্গা যাচ্ছিল বলে আমি

সেটাকে ডেকে উঠে পড়ে রওনা দিলাম বাজারের দিকে।

বাজার থেকে একগাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র কিনে ফেললাম উৎসাহের আতিশয্যে। ঊর্মির লিস্ট মিলিয়েও সব কিছু কিনতে ভুললাম না। আজ আমার প্রথম সংসার।

ফিরে এসে দেখলাম ঊর্মি তার শাড়ীটা গাছকোমর বেঁধে রীতি-মতন রান্নায় লেগে গেছে। আমি মাছ-তরকারি-মশলা ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে এলাম রান্নাঘরে এবং পাকা সংসারীর মতন ঊর্মিকে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, দ্যাখো তো মাছটা কি রকম এনেছি? বেগুনগুলো কিরকম টাটকা দেখেছো—কলকাতায় পাওয়া যায় না।

আমার নতুন ভূমিকায় আমি নিজেই মজা পাচ্ছিলাম।

ঊর্মি আমাকে তাড়া দিয়ে বললো, তুমি ভেতরে গিয়ে বসো তো! রান্নাঘরে কি করছো?

আমি ঊর্মিকে দরাজ গলায় হুকুম দিলাম, এক কাপ চা পাঠিয়ে দাও তো!

ঊর্মি অবাক হয়ে বললো, তুমি এই সময় চা খাবে? সকাল বেলা এক কাপের বেশী চা তো খাও না কখনও।

—আজ থেকে খাবো।

ভেতরে গিয়ে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বাঁ হাতের নখের ওপর সিগারেট ঠুকতে লাগলাম। ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি বোধ করছি। এক্ষুণি যেন একটা কিছু করা দরকার। খানিকটা দৌড়োদৌড়ি লাফালাফি করলে বেশ হতো। অথচ এ রকম ইচ্ছে আমার আগে কখনো হয় নি।

সেখান থেকে উঠে চলে এলাম দোতলায়। মিনিট দশেক শুয়ে রইলাম বিছানায়। তাও ভালো লাগছে না। আবার সেখান থেকে এলাম বারান্দায়। একটা বই খুলে বসলাম। চারদিক রোদে ঝলমল করছে। আমার গায়েও রোদ লাগছে। লাগুক, তবু আমি এখানেই বসে থাকবো।

বই খুললেও তাতে একটুও মন বসে না। গত রাত্রির কথা মনে পড়ে। মাঝরাত্রে দরজা খুলেই রজতকে দেখেছিলাম। সেটা আমার চোখের ভুল ? নিশ্চয়ই। চোখের ভুল ছাড়া আর কি ? ঊর্মিকে সামলাতে সামলাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। দুর্বল মস্তিষ্কে মানুষ এরকম অনেক কিছু দেখে। রজত আমাকে দেখে হেসেছিল···ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বলেছিল, চুপ—রজত আমাকে কি আরও কিছু বলতে চাইছিল ?

এক সময় ঊর্মি এসে জিজ্ঞেস করলো, এই, তুমি রোদ্দুরের মধ্যে বসে আছো কেন ?

আমি পেছন ফিরে ঊর্মির দিকে তাকালাম। এতক্ষণ আগুনের আঁচের কাছে ছিল বলে ঊর্মির মুখখানা লালচে দেখাচ্ছে। কপালে আর গালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম।

—ঊর্মি, তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে !

—সত্যি ! আয়নায় মুখটা একবার দেখতে হলো।

—থাক, আর মুখ দেখে দরকার নেই। জানো, আমার হঠাৎ খুব সর্দি হয়ে গেছে। তোমার রুমালটা দাও তো—

—কি করে সর্দি হলো ?

—কি জানি। কাল রাত্তিরে ছাদে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়েছিলাম—সর্দি আমার একটুও ভালো লাগে না। কি ওষুধ খাওয়া যায় বলো তো ?

—ওষুধ ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দরাজ গলায় হেসে উঠলাম। হাসতে হাসতেই বললাম, সবচেয়ে ভালো ওষুধ আছে আমার কাছে ? তারপর অবিকল ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে আমি প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে বার করলাম একটা ছোট ব্রাণ্ডির বোতল।

রীতিমত ভয় পেয়ে ঊর্মি তাকালে আমার দিকে। আমিও হকচকিয়ে গেলাম।

ব্রাণ্ডির বোতল আমার পকেটে এলো কি করে ? এ তো প্রায়

অসম্ভব ব্যাপার। সত্যিই ম্যাজিক নাকি ?

আমার অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়লো বাজার থেকে ফেরার সময় আমি একটা মদের দোকান দেখেছিলাম বটে। সে দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন ? আমি মদ কিনবো, দিনদুপুরে, এ কি কল্পনা করা যায় ? কেউ কি আমাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে ?

আমার বিস্ময় কয়েক মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী হয়েছিল। তারপরই যেন আমার মনে হলো, আমার পকেটে একটা ব্রাণ্ডির বোতল থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি বোতলের ছিপি খুলে ঊর্মির দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, নাও, এক চুমুক খেয়ে দেখো না।

ঊর্মি বিস্ফারিত চোখে বললো, তোমার হয়েছে কি ?

—কি আবার হবে ? সর্দি হলে ব্রাণ্ডি খেতে হয়, এ তো সবাই জানে।

—তুমি, তাই বলে তুমি—

ঊর্মিকে কথা শেষ করতে দিলাম না। বোতলটা এগিয়ে নিয়ে গেলাম ওর মুখের দিকে। ঊর্মি হাত দিয়ে জোরে সেটা ঠেলে দিল।

—তুমি এ রকম করছো কেন ? আগে বুঝি কখনো ব্রাণ্ডি খাও নি ?

—আর কোনো দিন খাবো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।

এটা যেন খুব হাসির কথা, এই রকম ভাবে হেসে উঠলাম আমি। তারপর বোতলটা নিজের মুখের কাছে এনে ঢক ঢক করে ঢেলে দিলাম গলায়। বোতলটার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পানীয় একসঙ্গে নামলো আমার গলা দিয়ে, মুখটা একটুও বিকৃত হলো না। খুব তৃপ্তির সঙ্গে আঃ বলে একটা সিগারেট ধরালাম।

ঊর্মি পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে আছে। আমার মুখের দিকে ওর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ, মনে হয় যেন পলক পড়ছে না।

আমি ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলাম, কি, ও রকম ভাবে কি

দেখছো ?

—তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

—অন্যরকম মানে কি রকম ?

—আয়নায় একবার দেখো।

তুমিই তো আমার আয়না।

হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। রাস্তা থেকে বারান্দায় সব কিছু দেখা যায়—কোন পথ চলিত লোক কিংবা বাড়ির মালী আমাদের এই অবস্থায় দেখতে পাবে। সেদিকে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই।

ঊর্মি ত্রাসে চেঁচিয়ে উঠলো, ছাড়ো, ছাড়ো।

—না, ছাড়বো না।

–তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ?

—আমি তো বরাবরই পাগল।

ঊর্মিকে আর কথা বলতে না দিয়ে সেই অবস্থাতেই টানতে টানতে নিয়ে এলাম শোবার ঘরে, একটানে ওর শাড়ী খুলে ফেললাম।

ঊর্মি বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি যেন কোনো নারীকে বলাৎকার করছি এই ভঙ্গিতে অতি দ্রুত ব্লাউজের বোতাম ছিঁড়ে শায়ার দড়িতে গিঁট পাকিয়ে, ওকে নিয়ে দড়াম করে পড়ে গেলাম বিছানার ওপর। তারপর বর্বরের মতন শুধু সম্ভোগেই মত্ত হয়ে রইলাম।

এই সময়টাতে ঊর্মি একটাও কথা বলে নি। তারপর খুব ধীরে ধীরে ওর বিস্রস্ত বসন ঠিক করলো। মুখ নীচু করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। যেন ও খুব অপমানিত হয়েছে। আমি সিগারেট ঠুকতে লাগলাম নখে।

হঠাৎ এক সময় মুখ তুলে ঊর্মি রীতিমতন দৃঢ় গলায় বললো, আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। মাঝখানে আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বলে আমি রজতের কাছে চলে গিয়েছিলাম।

সেটা ভালোবাসা নয়, শুধুই মোহ—এখন আমি ভালোই বুঝতে পেরেছি। রজত আমার কেউ নয়। রজত বেঁচে নেই। তুমি রজতকে ভুলে যাবে বলেছিলে, তুমি কথা দিয়েছিলে—

—তোমরা মেয়েরা বড্ড ন্যাকা হও।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠাস করে ঊর্মির গালে একটা চড় বসালাম। অত্যন্ত জোরে। ঊর্মির ফর্সা মুখে আমার আঙুলের ছাপ বসে গেল।

ওকে সেই অবস্থায় রেখে আমি চলে এলাম বারান্দায়। ব্রান্ডির বোতলটা তুলে নিয়ে আবার চুমুক দিলাম। খুব তৃপ্তির সঙ্গে। যেন এ রকম ভাবে ব্রান্ডি পান করা আমার বহুদিনের অভ্যেস।

বোতলটা পাশে নামিয়ে রাখার পরেই মনে হলো, একি করলাম আমি ? ঊর্মিকে চড় মারলাম ? কোনো দিন স্বপ্নেও এ কথা ভাবি নি। ঊর্মিকে আঘাত করে আমি আনন্দ পাচ্ছি ? এ কি কখনো সম্ভব ?

আবার দৌড়ে চলে এলাম পাশের ঘরে। ঊর্মি ঠিক সেই একভাবে বসে আছে। আমি ওর পাশে গিয়ে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলাম, ঊর্মি, এ আমি কি করলাম! আমি বুঝতে পারি নি—ঊর্মি আমাকে ক্ষমা করো, লক্ষ্মীটি—

ঊর্মি মুখ তুললো। চোখ দুটো শুকনো। আমার ডান হাতটা চেপে ধরে বললো, তুমি আমাকে মেরেছো, সে জন্য আমি কিছুই মনে করি নি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে—রজতের কোনো স্থান নেই আমাদের জীবনে—সে হারিয়ে গেছে। সে আর কোথাও নেই—

আমার মেজাজটা আবার বদলে গেল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ গলায় বললাম, এসব আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করে কি লাভ! রান্নাবান্না হয়ে থাকলে খাবার দাবার দিতে বলো—

ঊর্মি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাবার খেতে বসে আমি দুটো কাঁচালঙ্কা চেয়ে নিয়ে কচ কচ

করে চিবিয়ে খেলাম। ঝাল লাগলো না একটুও। কোনো রান্নাই ঠিক পছন্দ হলো না আমার। নানা রকম অভিযোগ করতে করতেও অবশ্য খেয়ে ফেললাম অনেকখানি। আমার সাংঘাতিক ক্ষিদে পেয়েছিল। সারা জীবনে আমি কখনো যেন এত ক্ষুধার্ত বোধ করি নি।

খেয়ে উঠে বললাম, চলো উর্মি একটু বেরিয়ে আসা যাক।

উর্মি অবাক হয়ে বললো, এই রোদ্দুরের মধ্যে? এখন কোথায় বেড়াতে যাবে?

—চলোই না। বেরিয়ে পড়া যাক। তারপর দেখা যাবে।

—না, এখন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি ওর হাত চেপে ধরে বললাম, আরে চলো, চলো।

উর্মি এবার খুব কঠোর ভাবে বললো, আমি এখন কোথাও যাবো না। তুমি কি আমাকে জোর করে নিয়ে যেতে চাও?

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, ঠিক আছে, তাহলে তুমি থাকো আমি একাই চললাম।

—কোথায় যাবে একা?

—যেখানে খুশী।

—যেও না, আমি অনুরোধ করছি যেও না।

—শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না।

চটিটা পায়ে গলিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। হন হন করে খানিকটা হেঁটে এসে সেন লজ-এর কাছাকাছি থমকে দাঁড়ালাম। গেটের পাশ থেকেই দেখা যায় বাগানের ওপরের বাড়িটার বারান্দায় দুটি মেয়ে ও একজন পুরুষ বসে গল্প করছে। এ বাড়িটা একতলা। এরা বেশীর ভাগ সময় সামনের বারান্দাটাতেই কাটায়।

মেয়ে দুটির দিকে আমি খানিকটা লোভের দৃষ্টিতে তাকালাম। দু'জনেই মোটামুটি সুন্দরী। স্বাস্থ্যও ভালো। আমার ইচ্ছে হলো, ভেতরে ঢুকে ওদের সঙ্গে আলাপ করি। অসুবিধের কি আছে, এ

বাড়ির দু'জন লোক তো আমাকে যেতে বলেইছিল।

গেটের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম। এ আমি কি করছি? উর্মিকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে আমি অচেনা দুটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার কথা ভাবছি? আমি মনে মনে ঠিক করছিলাম, স্বেচ্ছায় উর্মিকে এক মিনিটের জন্যও চোখের আড়াল করবো না। সেই আমি উর্মিকে ফেলে রেখে এসে···

পেছন ফিরে আবার হন হন করে হাঁটলাম বাড়ির দিকে। গেটের কাছে এসে দেখলাম, বারান্দায় রোদ্দুরের মধ্যে উর্মি দাঁড়িয়ে আছে আমার প্রতীক্ষায়। আমি এক দৌড়ে বাগান পেরিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলাম। উর্মিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, উর্মি, উর্মি, আমি কি খারাপ হয়ে গেছি? আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি।

—তুমি আজ সারাদিন যে-রকম ব্যবহার করছো, তার একটুও তোমার মতন নয়।

—কেন আমি এ রকম করছি বলো তো?

—তোমার মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

—চলো, এখন একটু ঘুমোবে চলো। ভালো করে ঘুমোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

লক্ষ্মীছেলের মতন আমি উর্মির সঙ্গে চলে এলাম ঘরের মধ্যে। উর্মি বিছানায় বসে জোর করে আমার মাথাটা তুলে নিল ওর কোলে। আমার চুলের মধ্যে হাত বোলাতে লাগলো। উর্মির হাতের ছোঁয়ায় দারুণ শান্তি পেলাম। কেন আমি বাইরে গিয়েছিলাম রোদ্দুরের মধ্যে? এ রকম ভাবে যদি শুয়ে থাকা যায়, তার চেয়ে বেশী শান্তি কিসে?

এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই অজান্তে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি তাও জানি না। চোখ মেলে মনে হলো, বিকেল পেরিয়ে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

উর্মি তখনও আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে। এতক্ষণ

এরকমভাবে বসে থাকার কোনো মানে হয়, অনায়াসেই নামিয়ে দিতে পারতো।

ধড়মড় করে উঠে বসে বললাম তুমি ঘুমোও নি ?

—না।

—কেন ? শুধু শুধু বসে রইলে ?

—আমার ঘুম পায়নি। তোমার এখন কেমন লাগছে ?

—খুব ভালো। ব্রান্ডির বোতলটা কোথায় গেল ?

—তুমি এখন ব্রান্ডি খাবে নাকি ?

—তা ছাড়া কি খাবো ?

—এখন চা খাবার সময়—

—না, না, বেশী চা আমার ভালো লাগে না। ব্রান্ডির বোতলটা দাও না।

—তুমি তো আগে কখনো মদ খেতে না !

—এখন থেকে খাবো। রোজ খাবো—

—না, তুমি ওসব খেতে পারবে না।

—আঃ, তর্ক করছো কেন ? বলছি বোতলটা এনে দাও, তা নয় যত আজে বাজে কথা—

—তুমি যদি এ রকম করো, তাহলে আমরা আর একদিনও এখানে থাকবো না। কালই কলকাতায় ফিরে যাবো।

আমি উর্মি'র কাঁধের কাছটা আঁকড়ে ধরে বললাম, কোথায় যাবে তুমি ? আমি আর তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না।

—ছাড়ো, অত জোরে ধরছো কেন, আমার লাগছে। ছাড়ো, ছাড়ো।

—না ছাড়বো না ! তোমাকে আর কোথাও যেতে দেবো না। দার্জিলিং থেকে পালিয়েছো বলে আবার এখান থেকেও পালাবে ?

দার্জিলিং ? কি বলছো তুমি ?

আমি উর্মি'র মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হিংস্র গলায় বললাম, কেন, এরই মধ্যে সব ভুলে গেলে ? দার্জিলিং-এর কথা মনে নেই ?

মেয়েছেলেরা এ রকমই হয়, তাই না ? এত ভালোবাসা ছিল, এত আদর—আর এরই মধ্যে সব ভুলে যেতে পারলে ?

উর্মি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, ওকি, তুমি আমার দিকে ও রকম করে তাকাচ্ছো কেন ? তুমি রজত নও, তুমি রজত নও—

আমি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললাম, চুপ ! এখন তো এসব কথা বলবেই ! ছেনালি মেয়েছেলে কোথাকার !

আমি উর্মি'র ঘাড়ের কাছটা কামড়ে ধরলাম। উর্মি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো। আমি ওকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে—

এই সময় দরজার বাইরে থেকে মালী ডাকলো, বাবু বাবু !

আমি হুংকার দিয়ে বললাম, কে ?

—আপনাকে ডাকতে এসেছেন।

—এখন কথা হবে না, চলে যেতে বলো।

—সেন লজ-এর দাদাবাবু আর দিদিমণিরা এয়েছেন। ওনারা বললেন—

উর্মি ততক্ষণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে মালীর নাম ধরে বললো, না, না, রতন, ওদের দাঁড়াতে বলো আমি আসছি—কিংবা, রতন, ওদের বলো ওপরে আসতে, ওপরে আসতে বলো এক্ষুণি।

আমি উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালাম। বাগানের মধ্যে সেন লজ-এর দু'জন মহিলা এবং তিন জন ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন। একজনের সঙ্গে একটা মোটরসাইকেল।

সেটা দেখেই আমার চোখ চক চক করে উঠলো। যেন অনেক-কালের পুরনো বন্ধুকে দেখলাম। চীৎকার করে বললাম, দাঁড়ান, আমি এক্ষুণি আসছি।

ঝড়ের বেগে দুমদাম করে নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। রথ থেকে লাফিয়ে বাগানে নেমে ছুটে ওদের কাছে গিয়ে বললাম, আপনারা এসেছেন ? বাঃ খুব খুশী হয়েছি, আসুন, ভেতরে এসে বসুন, আমার স্ত্রী আসছেন।

ওদের কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমি মোটর-সাইকেলটার কাছে গিয়ে আবার বললাম, বাঃ এটা তো দারুণ জিনিস, একেবারে নতুন, তাই না?

মোটরসাইকেলের মালিক বিগলিত হাস্যে বললো, হ্যাঁ, নতুনই প্রায়।

আমি লোকটিকে গ্রাহ্য না করেই বললাম, এটা একটু চালিয়ে দেখবো? আমার ছেলেবেলা থেকে মোটরসাইকেলের শখ।

লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। সে হ্যাঁ কিংবা না বলার আগে আমি তার কাছ থেকে মোটরসাইকেলটা নিয়ে নিলাম। স্টার্ট দিলাম পা দিয়ে। সেটা গর্জন করে উঠতেই আমার সারা শরীরে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। কি মিষ্টি আওয়াজ।

মোটরসাইকেলটায় উঠে বসেই হুস করে বেরিয়ে গেলাম বাগান থেকে। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম ঊর্মির চিৎকার, না, না, যেও না। এই, কি করছো! আপনারা ওকে ধরুন। শিগগির ধরুন।

কিন্তু তখন আমাকে ধরার সাধ্য কারুর নেই। বাগান থেকে বেরিয়েই আমি বেঁকে গেলাম ডান দিকে। খোলা রাস্তা দিয়ে গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ছুটে চললো।

হু হু করছে হাওয়া, তার মধ্য দিয়ে আমি ছুটে যাচ্ছি, অসম্ভব ভালো লাগছে। হাত দিলাম প্যান্টের পেছনের পকেটে, ব্র্যাণ্ডির বোতলটা বার করার জন্য। সেটা নেই। আনা হয় নি। কেন যে সেটা আনলাম না বুদ্ধি করে!

পরমুহূর্তেই আমার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। আমি মোটরসাইকেল চালাচ্ছি! জীবনে কখনো মোটরসাইকেলে উঠি নি। কি করে স্টার্ট নিলাম, কি কখনো এর ওপরে বসে আছি!

থামাতে হবে, এক্ষুণি থামাতে হবে। কিন্তু থামাতে তো জানি না। কোথায় ব্রেক? কোথায় ক্লাচ? গাড়িটা চলছে কি করে?

সামনে কতকটা দূরে একটা গরুর গাড়ি। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, এবার আমি মরবো। গাড়িটা থামাতেই হবে যে কোনো

উপায়ে।

আমার মাথার ভেতরে কে যেন ফিস ফিস করে বললো, কোনো ভয় নেই, ঐ তো গরুর গাড়ির পাশ দিয়ে জায়গা আছে।

আমি বুঝলাম, এটুকু জায়গা দিয়ে আমি যেতে পারবো না। গাড়ি থামাতেই হবে। থামাতে পারছি না। একমাত্র লাফ দিয়ে পড়া—

আবার কে যেন মাথার মধ্যে বললো, কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই, এই তো চমৎকার জীবন, কি দারুণ উত্তেজনা—এখানে কি কেউ ভয় পায়?

গরুর গাড়িটা খুব কাছে এসে গেছে। অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি, গরুগুলোর জ্বলজ্বলে চোখ, এবার ধাক্কা লাগবে। এখনো যদি লাফিয়ে না পড়ি—

—না, না, লাফিও না।

হ্যাঁ, আমাকে বাঁচতেই হবে।

পরক্ষণেই প্রচণ্ড একটা শব্দ। আমার চোখের সামনে চড়াৎ করে তীব্র হলদে আলোর একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। তারপর সব অন্ধকার।

চোখ মেললাম হাসপাতালে। শরীরে অনেকগুলো ব্যাণ্ডেজ। তবু আমার মনেই পড়ছিলো না কেন হাসপাতালে এসেছি। কি হয়েছিল আমার? কথা বলতে গেলাম। কণ্ঠস্বরই যেন বেরুচ্ছে না। আমি কি কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি?

নিজের শরীরটার দিকে তাকালাম। আমার দু'খানা হাত, দু'খানা পা ঠিকই আছে। আমি শুয়ে আছি হাসপাতালের খাটে। কেন? আমার মনে পড়ছে, রাত্তিরবেলা ঊর্মি ভয় পেয়েছিল, ওকে আমি সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। তারপর থেকে কি হয়েছে?

চোখের সামনে থেকে যেন হালকা ধোঁয়া সরে যাচ্ছে। মাথার মধ্যেও যেন জলস্রোতের শব্দ। না, না, জলস্রোত নয় তো একটা মোটর সাইকেলের আওয়াজ, এবার আমার মনে পড়ছে।

ঊর্মি দাঁড়িয়েছিল একটু দূরে। আমাকে চোখ মেলতে দেখে এগিয়ে এলো। তক্ষুণি আমার মনে হলো, ঊর্মিকে একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আমার তক্ষুণি জানানো দরকার কিন্তু আমার কণ্ঠস্বর বেরুচ্ছে না যেন। গলা আটকে যাচ্ছে।

ঊর্মি আমার দিকে ও রকম অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে কেন? ঊর্মি কি এখনো ভুল করছে?

আমার চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে এলো।

ঊর্মি আমার খাটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বললো, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে জানালাম, না।

—তোমার চোখ দুটো মুছে দিই?

ঊর্মি আমাকে স্পর্শ করা মাত্রই আমার কণ্ঠস্বর ফিরে এলো। আমি মিনতিমাখা গলায় বললাম, ঊর্মি, আমি বিভাস।

আমাকে চিনতে পারছো তো?

: সমাপ্ত :

ছবিঘরে অন্ধকার

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com